# গাছ

– মোহাম্মদ আকরাম হোসেন

১৯৬৭ সাল। গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভর্তি হলাম কলেজে। কলেজে যাওয়ার পথে প্রথম দিনই দেখলাম তাকে রাস্তার পাশে। প্রথম দর্শনেই ঘটে গেল আমার জীবনে।

সবেমাত্র এসএসসি পাস করেছি। কৈশোরের প্রান্ত পেরিয়ে যৌবন ছুই ছুই করছি। প্রেমে পড়ার রোমান্টিক বয়সই বটে! কিন্তু একেবারেই একতরফা। চিনি না, জানি না, ঠিকানা দূরের কথা, নামটাও জানি না। প্রতিদিন কলেজে যাই–আসি। তাকে দেখি রাস্তার পাশে একই জায়গায়। একই ভঙ্গিতে। নির্বাক নিশ্চল। মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখি শুধু তার অপরূপ রূপ সম্ভার।

আসলে আমার ভালোবাসার বস্তু কোনো মানবী নয়। একটা ফুলেল বৃক্ষ। অপূর্ব সুন্দর অন্তত আমার কাছে। যেমন লম্বা তেমনি মোটা কাণ্ড। পূর্ণ বয়স্ক সবুজ–সজীব একটা গাছ। বিস্ময় শাখা প্রশাখায় কোনো ফুল নেই। কাণ্ডের ভেতর থেকে সরাসরি বেরিয়েছে ফুলের কাদিগুলো। লালের সঙ্গে হালকা হলুদে মেশানো রঙ, গন্ধও ভারী মিষ্টি। রূপগুণ দুয়েই ভরপুর।

কলেজ থেকে ফেরার পথে গাছের তলায় গিয়ে দাড়াই। ঝরে পড়া ফুল কুড়াই, গন্ধ শুকি। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করি। ক্রমেই তার সঙ্গে গড়ে ওঠে এক নীরব, নিবিড় বন্ধুত্ব।

আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেও নাম জানতে পারিনি। বয়স বা বংশবিস্তার সম্পর্কেও কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

নিজের অজান্তেই মনে একটা সংকল্প কখন যেন দানা বাধে! জীবনে এই প্রজাতির অন্তত একটা গাছ আমি লাগাবোই। কিন্তু চারা পাবো কোথায়? যতোটুকু জেনেছি যুগে যুগে নাকি দুই একটা ফল ধরে। কিন্তু গাছের নিচে কেউ কখনো চারা দেখেনি। হতাশ হইনি তবু। একটা গাছ যখন জন্মেছে তখন কোনো না কোনোভাবে এর বংশবিস্তার অবশ্যই ঘটে থাকে।

হঠাৎ করে বলা যায় আমার মাঝে একটা নতুন সত্তার জন্ম হলো। সামগ্রিকভাবে গাছের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো, ভালোবাসা জন্মালো। গাছ লাগাতে শুরু করলাম আম, জাম, কাঠাল, পেয়ারা, শিশু ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে যেসব গাছের চারা তৈরি সম্ভব।

তখনো বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়নি। আজকের দিনে সরকারি, বেসরকারি অসংখ্য নার্সারি পলিব্যাগে বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদন করে শস্তায় দোরগোড়ায় পৌছে দিচ্ছে। কিন্তু তখন সেই সত্তর দশকের গোড়ায় এগুলো কল্পনা করা যেতো না। তখন আজকের মতো গাছ লাগানো সম্পর্কে কোনো আগ্রহ বা সচেতনতাই ছিল না। আমিই চারা উৎপাদন করে গাছ লাগাতে শুরু করি। অনুভব করি, একটা গাছ লাগানো মানে শুধু পারিবারিক কল্যাণই নয়, গোটা দেশ তথা পৃথিবীর জন্য কিছু কল্যাণ করে যাওয়া। তাই আমি মনে করি, সব মানুষেরই উচিত সারা জীবনে অন্তত একটা গাছ পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যাওয়া।

এক সময় কলেজ জীবন শেষ হলো। বাংলা সাহিত্য নিয়ে এমএ পড়তে গিয়ে আরেক বিপত্তি ঘটলো। সাহিত্যের মাধ্যমে কিছু আনকমন গাছের নামের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যেমন শিরীষ, মহুয়া, পলাশ ও চম্পা।

*গান ও কবিতাগুলো কি ভারী মিষ্টি!*

*টিপ টিপ তারা দীপ জ্বলছে*
*এখনো রাতের নানা ছলনা*
*হাওয়ারা শিরীষ বনে দোল খায়*
*এখনো মনের কথা বল না।*

অথবা

*মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো*

কিংবা

*শিমুল, পারুল, চম্পা (চাঁপা) ডাকে*

*কর্ণফূলী নদীর বাকে।*

অথবা

*ও পলাশ, ও শিমুল কেন এ মন মোর রাঙ্গালে।*

এই যে শিরীষ, পলাশ, চম্পা, পারুল, মহুয়া, এ গাছগুলো আসলেই কি আমাদের দেশে আছে অথবা কখনো কি ছিল? নাকি কবিদের কল্পনা মাত্র? কতোজন মানুষ এসব গাছ চেনে বা দেখেছে বলুন তো? ইচ্ছা হয় না এই গাছগুলো অন্তত একবার চোখে দেখতে।

ফলে আরো একটি সংকল্প নিলাম এসব প্রজাতির গাছগুলো দেশের যে কর্নারেই থাক তা খুজে বের করবোই। শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেছি। কাজ উপলক্ষে জেলা সদর কুষ্টিয়া গেলেই শত ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় করে সেই বন্ধু গাছের সঙ্গে দেখা করে আসি।

আর এদিকে চলছেই আমার বৃক্ষরোপণ অভিযান। কিন্তু তাতে আমার তেমন তৃপ্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের *পরশ পাথর* কবিতার সেই ক্ষ্যাপার মতো আমি আসলেই খুজে ফিরছি সেই গাছ, সেই পরশ পাথর। এতোদিন যা লাগিয়েছি, যা লাগাচ্ছি তা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

ইতিমধ্যে অনেক সময় গড়িয়েছে। বাংলাদেশে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়েছে। আমার সংগ্রহে এসেছে চাপা, মহুয়া, পলাশ, বকুল, নাগেশ্বর। আম, জাম, কাঠাল, নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর ফল দিতে শুরু করেছে। শিশু, মেহগনি–র দাম দাড়িয়েছে পনেরো বিশ হাজারে। বিংশ শতাব্দী ইতিহাস হতে চলেছে। কিন্তু দেখা পাইনি বন্ধু গাছের। শুধু নামটা জেনেছি নাগলিঙ্গম। আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

২০০০ সাল। জীবনের চরম দুর্যোগময় সময় পার করেছি। স্ত্রীর ব্রেস্ট ক্যান্সার। অপারেশন করে ফেলে দিতে হবে একটা স্তন। ঢাকায় বাংলা মোটরের কাছে এক ক্লিনিকে ভর্তি করালাম। টু সিটেড রুম।

আগেই ভর্তি হয়েছেন একজন। মহিলার গলার ভেতর ক্যান্সার। সঙ্গে স্বামী ও মেয়ে। ভদ্রলোক সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন বন বিভাগের চাকরি থেকে। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগলো না মোটেও। সমব্যথায় দুঃখী দুটি মানুষ। তিনি অত্যন্ত রসিক ও মিশুক। বয়সের ব্যবধানে চাচা ডাকলেও সম্পর্কটা হলো বন্ধু সুলভ।

বন বিভাগের লোক। আলাপ শুরু হলো গাছ নিয়ে। মনে হলো আমার এতোদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। চাচা শুধু নাগলিঙ্গম চেনেন তা–ই নয়, রমনা পার্কে নিয়ে গিয়ে গাছ দেখিয়ে আনলেন। মনে মনে ঢাকা শহরের নার্সারিগুলোর হিসাব কষে বললেন, ভাগ্য ভালো হলে চারা মিলতেও পারে।

আমি বেজায় উৎফুল্ল।

অনেকের মনে হতে পারে, যার স্ত্রী ক্যান্সারে আক্রান্ত, সামান্য গাছ নিয়ে তার এতো মাতামাতি ও উৎফুল্ল হওয়া সাজে কি?

সাজে। মানব মন বড়ই বিচিত্র।

পরদিন বের হলাম চারার খোজে। ফার্মগেটের কাছেই জায়গাটা নাম *খামার বাড়ি*। ওখানে অনেকগুলো নার্সারি আছে। যারা শৌখিন গাছের চারা খুজছেন তারা চোখ বুঝে চলে যাবেন ওখানে।

কাউন্টারে বসা অল্প বয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল চারা আছে।

দাম কতো? শুধালেন চাচা।

একশ টাকা। একশ টাকা! চাচা বিস্মিত এবং নাখোশ।

মহিলা গড় গড় করে বলে চলেছেন, বাংলাদেশে এই চারা উৎপন্ন হয় না। ইনডিয়া থেকে ব্ল্যাকে আসে। হাত বদলে দাম বাড়ে। তাছাড়া এই চারা বিক্রি হয় খুবই কম। দাম একটু বেশি না নিলে পোষায় না। অবশ্য পাকা মেমো পাবেন। এটাই আমাদের নির্ধারিত রেট।

চাচা আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি এতোক্ষণ মনে মনে কৌতুক অনুভব করছি। একশ কেন পাচশ–এক হাজার হলেও চারা নেবোই। যাকে হন্যে হয়ে খুজছি প্রায় তিন যুগ, যে আমাকে করে তুলেছে প্রকৃতিপ্রেমিক। বললাম, মেমো করুন।

স্ত্রী ক্যান্সার আক্রান্ত, মরে কি বাচে আল্লাহই জানে। অর্থনৈতিক সংকট, তার সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অসংখ্য জটিল চিন্তায় মন–মেজাজ ভারাক্রান্ত। তা সত্ত্বেও ঘোর বর্ষায় মেঘাবৃত আকাশে হঠাৎ করেই এক ফালি চাদের নির্মল আলোয় ক্ষণিকের জন্য হলেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আমার মনের আকাশ।

*মথুরাপুর, কুষ্টিয়া থেকে*

***প্রসঙ্গক্রমে : বকুল, পলাশ, মহুয়া, চাপা, নাগেশ্বর, হিজল, কদম, ছাতিম, কাঞ্চন, নাগলিঙ্গম (ফুল), চালতা, জলপাই, কাটবাদাম, আমলকি, হরিতকি, (ওষুধি জাতীয় ফল) একই সঙ্গে এতোগুলো গাছ কেউ যদি দেখতে চান, নির্দ্বিধায় চলে আসুন। থাকা- খাওয়া ফ্রি। ব্যবস্থা এই গরিবখানায়।***

# রাহুগ্রস্ত

– মঞ্জিষ্ঠা মল্লিকা

গত বছর ভালোবাসা দিবসে ছিল আমার এনগেজমেন্ট। আমার বাবা আর একমাত্র ভাই বড় যত্নে আমার জন্য সর্বগুণ সম্পন্ন, সুদর্শন, উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র এবং ভালো চাকুরে সুপাত্র জোগাড় করেছিলেন। আর দশটা যোগ্য পাত্রীর মতো আমার ছিল ফর্শা রঙ, বাবার সচ্ছলতা এবং বেশ কিছুদিন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অভিজ্ঞতা। এসবের জোরে আজ আমি সেই সুদর্শন ভদ্রলোকের স্ত্রী।

আজ প্রায় একটা বছর ধরে এই সুদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গ এবং অনেক কিছুই এক ঝুড়ি গল্প হয়ে জমে আছে বুকের মধ্যে। আজ আমার এই অদ্ভুত, অস্বস্তিকর এবং হয়তো বা অরুচিকর গল্পের ঝুড়ি খুলবো শুধু যাযাদির কাছে। এ সুযোগ না পেলে হয়তো বা বুক ফেটে মরেই যেতাম।

বিয়ের আগে প্রেম করিনি। ভাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়, অজ্ঞাত প্রেরকের কার্ড, চিঠি, ফুল প্রভৃতি দেখে রোমাঞ্চিত হওয়া, ব্যস। মফস্বলীয় আবহাওয়ায় ব্লু ফিল্ম, এডাল্ট মুভি এসব কেবল শুনেছিই। কখনো টিভি পর্দায় অতি সতর্কতায় কিংবা নিভৃতে নিবিষ্ট মনে যা কিছু দেখেছি বা শুনেছি সেগুলোর ভেতর দিয়েও সেক্স ছিল আমার কাছে এক অনাস্বাদিত সৌন্দর্য এবং শুধুই সৌন্দর্য।

বিয়ের পর প্রথম রাতটা কেটেছিল বাবার বাসায়। তার পরদিনই স্বামীর কর্মস্থলে। অফিসের কোয়ার্টারে আমার নতুন জীবন। বেশ ছিমছাম, বোঝাই যায় যে, আমি আসবো বলে বিশেষভাবে গোছানো। খুব ভালো লাগছিল। আমাদের রাতের ট্রেন ছিল। পৌছাতে পৌছাতে ভোর, একটু পরেই কর্তার হাসি মুখে অফিস যাত্রা।

এরপর ভাবতে বসলাম। গোলাপি পাখায় ভর করে উড়ি। ঘুরে ঘুরে দেখি আর ভাবি। বিয়ের পর মুহূর্ত থেকে এতো ব্যস্ত সময় গেছে যে, তার দিকে ভালো করে তাকানোরও অবকাশ পাইনি। বিয়ের রাতে তাকে কিছুটা

অসংযত, অধৈর্য দেখে নিশ্চিত ছিলাম যে, আজ আর বাধা দিয়ে কাজ হবে না এবং বাধা দেয়া তো উচিতও নয়। খুব নার্ভাস লাগছিল।

এক পাড়াতো ভাবি কিছু কনট্রাসেপটিভ দিয়েছিল। সেগুলোকে পরম সম্পদ বলে মনে হলো। বাসার সামনে প্রায় ফাকা একটা রাস্তা, একটু দূরে একটা পরিষ্কার পুকুর। খুব ইচ্ছা করছিল হাটতে। ভাবলাম বিকেলে হাটতে বের হবো। খবু যত্ন করে একটা রান্না করলাম। খিচুড়ি, ডিম আর আলু ভাজি। স্নান করে একটু সেজে দাড়িয়ে ছিলাম তার প্রতীক্ষায়।

সে রিকশা থেকে নামলো। প্রায় ছুটেই উপরে এলো। আমায় দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে এলো।

তারপর কিছু বোঝার আগেই ভীষণ মর্মান্তিকভাবে আমায় ধর্ষণ করলো।

আমি বিস্ফারিত চোখে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিতে চেয়েছিলাম।

ভীষণ ব্যথা পাচ্ছি টের পেয়ে সে হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেছিল।

তারপর বিকেল হলো। জানালার বাইরে কনে দেখা শেষ আলোটুকুও নিভে গেল। অন্ধকারে তাণ্ডব চললো কিছুক্ষণ। এরপর আমার নগ্ন পতিদেব উঠে আলো জ্বাললেন, তোষকের নিচ থেকে বের হলো অবিশ্বাস্য ছবিতে ভরা ম্যাগাজিনগুলো।

আমি নির্বাক, স্থির হয়ে গেছি। কোনো অনুভূতিই আর টের পাচ্ছি না তখন। আমার সাধের খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়েছে, বারান্দায় মেলে দেয়া কাপড় চোরে নিতে পারে, আমার এসব কিছুই বলার শক্তি নেই আর।

রাত আটটা বাজে। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, তবু মুক্তি নেই। তারপর আর মনে নেই কিছু। ঘুম ভাঙলো অস্বস্তিকর এক অবস্থার মধ্যে রাত তখন তিনটা। এরপর আবার সেই ধর্ষিতা হওয়া ক্রমাগত।

আজ এতোগুলো মাস ধরে চলছে এভাবেই। মুক্তি নেই সেই বিশেষ দিনগুলোতেও। সমস্ত বাসাটা পর্ণোয় ঠাসা। একটি শ্রেণীর ফিল্মই কেবল চলে। কখনো কখনো ধর্ষিতা হতে যদিও বা ভালোলাগে তার ওই সময় ব্যবহৃত অশ্লীলতম ভাষা গুড়িয়ে দেয় সমস্ত রুচিবোধের ভিত্তি।

সে আমায় অনেক গহনা দিয়েছে। বানিয়ে দিয়েছে ঘরভরা ফার্নিচার। সে যৌতুকলোভী না, সে আমার বাবা, মা, ভাইয়াকে প্রচুর গিফট পাঠায়। সে আমায় যত্ন করে ভাত বেড়ে দেয়। মনে করে পিল খাওয়ায়। তারপর সে তার সমস্ত ভালোত্বের, সমস্ত মহত্বের দাম বুঝে নেয়।

বলেছি আমার ভালো লাগে না। বলেছি কষ্ট হয়। বলেছি একটু কমাও। বিনিময়ে কেবলই হুমকি, প্রস্টিটিউটের কাছে যাবে। উইকএন্ড এলে তো কোনো কথাই নেই। রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ি।

এই কি সেই মহা আকাঙ্ক্ষিত বিবাহিত জীবন কিংবা সৌন্দর্যময়, প্রেমময় সেক্স? আমার নিজস্বতা, শুদ্ধতা, রুচিবোধ সব কিছু বিসর্জন দিয়েও দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যখনই আমার সন্তানের কথা ভাবি তখন শিউরে উঠি। সন্তানের মন অথবা রুচি যদি বাবার মতো হয় তাহলে তাকে পৃথিবীতে এনে কি লাভ? তাছাড়া বাসার এই অশ্লীল পরিবেশ যদি তাকে প্রভাবিত করে?

অনেকে হয়তো আমার লেখা পড়ে আমায় বোকা ভাববেন। হয়তো বলবেন, সেক্স তো এ রকমই হয় বা এটা নিয়ে অভিযোগ করার কি আছে! আসলে আমার যন্ত্রণাটা হলো, স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা। একটা স্বপ্ন ছিল কোনো এক স্বপ্ন পুরুষ আমার হাত ধরবে, তার পর চুম্বন, এরপর আরো অনেক পথ, তারও পরে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। সে সব স্বপ্ন কেবলই নিজেকে এটো, অপবিত্র ভাবতে শেখায় আজ।

জানি না পুরুষ মাত্রই এ রকম কি না। তবে ছেলেদেরকে বলছি, আমার স্বামীর আচরণ আমার মনে এই এতোদিনেও তার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, মমতা কিংবা ভালোবাসা জাগাতে পারেনি।

অথচ বিয়ের আগে আমার জীবনে অন্য কোনো ছেলে আসেনি। তার অর্থ হলো, ভালোবাসা আর সেক্স সমার্থক নয় সব ক্ষেত্রে।

মেয়েদেরকে বলছি, বিয়ে হলো সেক্সের সামাজিক পারমিশন। ভালোবাসুন, তাকে সেক্সের পর্যায়ে পৌছাতে দিন, তারপর ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ে করুন।

আজ এই ভালোবাসার দিনে সবাই ভালোবাসার মানুষটিকে পরম মমতায় চুমু দিন, তার হাতটি ধরে দুই মিনিট বসে থাকুন। তাহলেই দিনটি সার্থক হবে। যৌনতা থাকুক না আগামী দিনের জন্য। এটা খাদ্য কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের মতোই একটা মৌলিক চাহিদা মাত্র। এটার জন্য ভালোবাসা দিবসের দরকার হয় না।

*যশোর থেকে*

# প্রেম- পিরিতি ফেডারেশন

– মাইন্ডটাচ

যায়যায়দিনের নিয়মিত পাঠক এবং লেখকদের জন্য সুখবর। আনন্দের সঙ্গে সবাইকে জানাচ্ছি যে, তরুণ–তরুণীদের নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি সংগঠন খুলেছি। এই সংগঠনের একমাত্র সদস্য তারাই হতে পারবেন যারা প্রেমিক–প্রেমিকা। এবং আমাদের এ সংগঠনের কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রেমিক–প্রেমিকাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করছি, এ সরকার ক্ষমতায় বসে ভালোবাসা দিবস এবং দেশে প্রেমিক–প্রেমিকাদের জন্য সেবামূলক ও বিনোদনমূলক কিছুই করছে না। এতে আমরা প্রতারিত হচ্ছি। আমরা প্রেমিক–প্রেমিকারা রিকশায় বসে ঘুরতে গিয়ে ছিনতাই এবং নানান হয়রানির শিকার হচ্ছি। এ ব্যাপারে সরকার জরুরি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাই আমরা কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।

আমাদের ফেডারেশন কর্তৃক বারো দফা দাবি সরকার না মানলে আলটিমেটামসহ সরকার হটাও আন্দোলনের ডাক দিতে হবে। তাই প্রেমিক–প্রেমিকাদের যার কিছু আছে তা–ই নিয়ে রাজপথে নামতে হবে। প্রয়োজনে হরতাল, ভাংচুর চলবে।

*প্রেমের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী প্রকল্প হাতে নিয়ে প্রেমকে সকল বাধা–বিপত্তি থেকে রক্ষা করা* – এই আদর্শকে সামনে রেখে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন :

প্রেমের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী পিতা–মাতার মতামত মানি না, মানবো না।

আমাদের ফেডারেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত বারো দফা কর্মসূচি পেশ করা হলো :

*এক.* সকল তরুণ–তরুণীদের অবাধে প্রেম করতে দিতে হবে।

*দুই.* প্রেমিক–প্রেমিকাদের প্রণয় নিবেদনের জন্য আলাদা পার্ক ও রেস্টুরেন্ট তৈরি করতে হবে।

*তিন.* স্কুল কলেজের মধ্যে প্রেম বিষয়ক সাবজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সাব প্রাকটিকালের ব্যবস্থা করতে হবে।

*চার.* স্বৈরাচারী পিতা–মাতার অশুভ কালো হাত যেন কোনো তরুণ–তরুণীর প্রেমকে স্তব্ধ করতে না পারে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের একটি আলাদা মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে হবে।

*পাচ.* প্রেমের ব্যাপারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা গড়ে তুলতে বিটিভিতে প্রেম বিষয়ক *যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভুলে না মোরে* এ সিরিজের ছবি ও নাটক বেশি করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

*ছয়.* ভালোবাসা দিবসের দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করতে হবে।

*সাত.* প্রেমে ব্যর্থ প্রেমিক–প্রেমিকাদের মাসিক ভাতা দিতে হবে।

*আট.* ছ্যাক খাওয়া প্রেমিক–প্রেমিকাদের বিনামূল্যে ছ্যাকামাইসিন ট্যাবলেট ও ইনজেকশন সরবরাহ করতে হবে।

*নয়.* কমপক্ষে ছয় বছর সফলভাবে প্রেম করার পর কেউ কোর্ট ম্যারেজ করলে তাদেরকে প্রেমকাপ (দশ ভরি স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত) পুরস্কার দিতে হবে। এটির নাম দিতে হবে হু. মু. এরশাদ প্রেমকাপ।

*দশ.* প্রেমে ব্যর্থ অর্থাৎ পর পর তিনবার প্রেমে ব্যর্থ হলে প্রেমিক–প্রেমিকাদের প্রেমের সহজ পন্থা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সরকারি খরচে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

*এগারো.* ব্যর্থতা সইতে না পেরে কেউ সুইসাইড বা আত্মহত্যা করতে চাইলে তাকে পরলোকে যাবার সুবিধা করে দিতে হবে।

*বারো.* রেডিও–টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে স্বৈরাচারী পিতা–মাতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তারাও এক সময়ে প্রেম করেছেন।

এই আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আসুন, আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করে প্রেমিক–প্রেমিকাদের সফলতার মুখ দেখিয়ে ঐতিহাসিক চলনবিলে জনসমাবেশের আয়োজন করে বারো দফা কর্মসূচি সফল করে তুলি। আমরা দেখছি, আমাদের জাতীয় *প্রেম–পিরিতি ফেডারেশন*–এর জনমত ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। ফলে দেশের অন্যান্য রাজনীতি দলগুলোর পক্ষে জনসমর্থন কমছে। আমরাই দেশের তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছি। তাই আমরা ভেবে দেখেছি, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের *ফেডারেশন জুটি পার্টি* হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আমাদের জয় নিশ্চিত। পরবর্তীকালে আমরা ধীরে ধীরে সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের জুটি পার্টি–র নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবো।

যাযাদির পাঠক এবং লেখকদের জন্য আরেকটি সুখবর রয়েছে যে, আমাদের জাতীয় প্রেম–পিরিতি ফেডারেশনের সাড়ে সাতশ কোটি টাকা অনুদান এবং এ সংগঠনের সকল প্রকার রদবদলের ক্ষমতা যায়যায়দিনের হাতে অর্পণ করবো বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাই এ আনন্দের দিনে আসুন *প্রেম–পিরিতি আছে দুনিয়ায়, ভালোবাসার আছে যে উপায়* এই স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করি এবং নিজে প্রেম করি ও অপরকে প্রেম করতে উৎসাহিত করি।

*সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : প্রেম মনের জন্য ক্ষতিকর।*

*মাইন্ডটাচ গিফট কর্নার, নরসিংদী থেকে*

## সন্ত্রাসী প্রেমিক

আমি তখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। আমি দেখতে আহামরি কিছু না হলেও সুশ্রী তো বটেই, তার উপর ইউনিভার্সিটি জীবনের প্রথম অনুভূতি, ভালোলাগা, সব মিলিয়ে বোধহয় চেহারার ওপরে লাবণ্যতা একটু বেশিই ফুটে উঠেছিল। অন্তত সবার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম। এর মধ্যে কয়েকজনের দৃষ্টি যে প্রশংসা ছাড়িয়ে ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে সেটাও বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হতো না।

যাহোক, সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে ঠিকই আনন্দমুখর দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সকল সুখের মূলে করাঘাত করে বসলো এক সন্ত্রাসী প্রেমিক। একদিন শীতের রৌদ্র উজ্জ্বল সকালের মিষ্টি রোদ গায়ে মাখতে মাখতে কলেজের উদ্দেশ্যে হেটে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার সামনে উপস্থিত হলো আমার জন্য পাগল স্থানীয় সেই সন্ত্রাসী। আমি যখন তার দিকে জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তখন আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে একাই একাধারে যেটা বলে গেল তার মর্মকথা অন্য দশজন আবেগময় প্রেমিকের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, সে আমার মতামত জানতে না চেয়েই আমাকে কিছুদিন ভাবার সুযোগ দিয়ে যেমন দ্রুত এসেছিল ঠিক তেমন দ্রুত চলে গেল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে, আমি আমার বাবা মায়ের একটি মাত্র মেয়ে হওয়ায় অনেক আগে থেকেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম কারো সঙ্গে স্রেফ বন্ধুত্ব ছাড়া এমন কোনো সম্পর্ক তৈরি করবো না যার জন্য আমার জীবনসঙ্গী নির্বাচন থেকে আমার পরিবার বঞ্চিত হয়। এরপর প্রায় কয়েক মাস কেটে গেল সেই উদ্ধৃত প্রেমিক আমার সামনে আসেনি। এমনকি আমারও তার কথা কখনোই মনে আসেনি। পরে অবশ্য জেনেছি এই কয়েক মাস সে লাল ঘরে সময় কাটিয়েছে এবং সেখানে তার যাতায়াত ছিল নিয়মিত।

সম্ভবত লালঘর থেকে ছাড়া পেয়েই আমাকে চমকে দিয়ে সে আবার আমার সামনে হাজির হলো এবং আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলো। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী ভাবেই আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

কিন্তু আমার মতামত যে গ্রাহ্য করলো বলে মনে হলো না। কারণ. যে কোনোভাবেই হোক সে *তোমাকে চাই* এই কথাটা যাবার আগে জানিয়ে গেল।

তার নমুনা পেলাম কয়েকদিন পর থেকেই। প্রতিদিন কলেজে যাওয়া-আসার পথে সে আমাকে রীতিমতো বিরক্ত করতে লাগলো। যখন সে দেখলো কথায় কাজ হচ্ছে না তখন তার সাঙ্গপাঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গিফট পাঠাতে লাগলো। যদিও প্রতিটি গিফট তার কাছে ফেরত যেতো তবুও দেখলাম বিষয়টি আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে আমার পরিবারকে ব্যাপারটা জানালাম। যেহেতু সময়টা ছিল আওয়ামী লীগের এবং সে ছিল একজন বিএনপির ক্যাডার, তাই আমার অভিভাবকরা কৌশলে তাকে আমার ওপর থেকে তার কুদৃষ্টি সরাতে বাধ্য করলো। এরপর একটু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো। জানতে পারলাম ওই সময়ের অধিকাংশই সে লালঘরে ছিল। তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে ভালো রেজাল্ট করে সবেমাত্র থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। আবার ধূমকেতুর মতো সেই রাহুর আবির্ভাব ঘটলো। বলা বাহুল্য, ততোদিনে ক্ষমতার হাত বদল হয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

এরপর শুরু হলো আমার জীবনের ঘোর ঘনঘটার দিন। প্রথমদিকে মানুষ রূপী সেই রাহুর রূপ স্বাভাবিক থাকলেও ক্রমেই তা সন্ত্রাসী রূপে প্রকাশ পেতে থাকলো। আমার অভিভাবকরা কোনোভাবেই তাকে দমন করতে পারলেন না। এমনকি আমি গিয়ে বর্তমান এক মন্ত্রীর বৌকে সব কিছু জানিয়েও কোনো সুফল পেলাম না।

সন্ত্রাসী প্রেমিকের উক্তি ছিল, পুলিশ তাকে কিছুই করতে পারবে না। কারণ, সেই নাকি পুলিশকে চালায়।

বুঝতে পারছিলাম আমার বাবা-মা কতোটা টেনশনে দিনাতিপাত করছিলেন। যেহেতু তখনকার ক্লাসগুলো করা খুবই জরুরি ছিল, তাই কলেজও বন্ধ করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমার পরিবার আমাকে পরীক্ষা দেয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সমঝোতা করে চলার অর্থাৎ কথা দিয়ে চিড়ে ভেজানোর পরামর্শ দিলো।

কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাই সে যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো তখন তার ব্যবহার আরো উগ্র হতে লাগলো। আমাকে নিয়ে সবার সামনে বাজে মন্তব্য করতে লাগলো, এমনকি আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার হুমকি দিতে লাগলো।

এভাবে একটা মানুষ কতোটা সহ্য করতে পারে। তাই একদিন কলেজ চত্বরে তাকে যাচ্ছেতাইভাবে কিছু কথা বলে ফেললাম। এর পরিণাম হিসেবে আমার কলেজ করা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ কথাগুলো বলে আমি যখন আমার ডিপার্টমেন্টে এলাম তখন তার গ্রুপ নিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য সে রেডি হয়ে আছে। কাজেই ওই দিন স্যারদের হেফাজতে আমাকে রুমে পৌছাতে হলো।

আমি যখন স্যারদের সঙ্গে রুমের উদ্দেশে যাচ্ছি তখন সে পাশ দিয়ে বলে গেল, স্যারেরা আমাকে কতোদিন পাহারা দেবে।

এরপর শুরু হলো আমার বন্দী জীবন। পরীক্ষার প্রস্তুতি, গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, ব্যবহারিক ক্লাস, সব কিছু ফেলে রেখে বাড়িতে চলে গেলাম।

বাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম, আমরা মেয়েরা আজও কতো অসহায়। শুধু তাই নয়, সমাজে মেয়েরা যে কতো নিপীড়িত, কতো নির্যাতিত তা তখন টের পেলাম যখন দেখলাম আমার আত্মীয়স্বজন, কিছু বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতজনেরা যারা ব্যাপারটা জানে তারা আমাকেই দোষারোপ করছে। আমি সবাইকে যতোই বোঝার চেষ্টা করি না কেন, তারা আমার কথা বিশ্বাস না করে মেয়েদের পিঠে যে বেশি দোষের সিল মারা আছে তা দিয়ে আমাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেধে ফেলতে চাইছে।

আগে যখন আমার সামনে কেউ বলতো, *মেয়েরাই মেয়েদের বড় শত্রু, তারা একে অপরকে হিংসা করে, একে অন্যের পেছনে কুৎসা রটায়* তখন তাদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু এটা যে কতো বড় সত্য তা বুঝতে পারলাম আমার কিছু পরিচিত বড় আপু এবং কিছু বান্ধবীদের দিয়ে। যারা নিয়মিত আমার সঙ্গে চলাফেরা করেছে, প্রতিটা ঘণ্টা দেখেছে। কিন্তু আমাকে সহযোগিতা না করে আমার বিরুদ্ধচারণ করেছে।

তারপরও আমি মনোবল হারাইনি। কিন্তু তখন আমার মন ভেঙে গেল যখন আম্মার কাছে শুনলাম আব্বা সবার কথা শুনে রাগ করে আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বলেছেন। কারণ, সবাই নাকি বলেছে, কলেজে এতো মেয়ে থাকতে সে কেন শুধু আমাকেই ডিস্টার্ব করে বা আর কোনো মেয়ে তো এই সমস্যায় পড়েনি। আমি কেন পড়েছি? যদিও আমি আমার আব্বার খুব আদুরে মেয়ে এবং পড়াশোনা বন্ধ করাটা ছিল তার রাগের কথা। তবুও আমি এতো কষ্ট পেয়েছিলাম যে, ক্ষণিকের তরে মনের মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বুঝলাম সিমিরা কতোটা কষ্টে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

যাহোক, মনের জোরে সব কিছু তুচ্ছ করে আমার কিছু অভিভাবক, কিছু বন্ধু-বান্ধবী এবং স্যারদের সহায়তায় দুই এক মাস পরে পরীক্ষার আগে কিছুদিন ক্লাস করলাম। পরীক্ষা শেষ হলো। ব্যবহারিক ক্লাস শুরু হলো।

এর মাঝে মানুষের চামড়া গায়ে ধারণকারী সেই পশুটি দূর থেকে আমাকে কয়েকবার দেখলেও সামনে আসার সুযোগ পায়নি। কিন্তু ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে সুযোগ বুঝে একদিন সে ঠিকই সামনে হাজির হলো এবং জানিয়ে দিল আমাকে সত্যিই ভালোবাসে। তাই আমার কোনো ক্ষতি সে করবে না। তবে আমি যতো দূরেই যাই বা যেখানেই থাকি না কেন, একদিন না একদিন সে আমাকে ঠিকই বিয়ে করবে।

আমি এখনো বুঝি না এ কেমন ভালোবাসা যেখানে কোমলতার পরিবর্তে কঠোরতা স্থান পেয়েছে।

সম্প্রতি আমার রেজাল্ট বের হয়েছে। আল্লাহর হাজার শোকর শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। কিছুদিন আগে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছি। আমি জানি না এতোদিনে সেই সন্ত্রাসী প্রেমিকের সুমতি হয়েছে কি না। যদি না হয় তাহলে কি অনার্সের মতো মাস্টার্সটা শেষ করে আসতে পারবো নাকি? শেষ প্রান্তে এসে সিমিদের পথই বেছে নিতে হবে কিনা সেটাই এখন আমার একমাত্র চিন্তা।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যশোর থেকে*

# চিঠি

– সঞ্জয় কুমার ভৌমিক

প্রিয়তমা আমার,

কেমন আছো তুমি? তোমার কাছে চিঠি লিখতে বেশ সর্তক থাকতে হয় আমাকে প্রতিনিয়ত। কেননা তুমি চিঠিতে ছড়িয়ে থাকা বাক্যগুলোর মাঝে কোনটিকে যে ভুল বোঝার উপকরণ হিসেবে বেছে নিয়ে আমাকে নীতিবাক্য শোনাবে কিংবা তিরস্কার করবে তা বোঝা সত্যিই সমস্যা।

তোমার বিন্দুমাত্র কষ্ট আমার কাছে পাহাড় সমান বেদনাময়। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি আজ এক বছর হলো। এবার নিশ্চয় কষ্ট পাবে না।

তোমার ভাবনার করিডোরে আমি কতোটা সক্রিয় জানি না। তবে আমার অনুভূতিতে তোমার ছায়া পড়ে প্রতিটি মুহূর্তে ।

একটু স্থির হও। তোমার অস্থিরতা আমাকে খুব বেশি ভাবায়। অনেক কিছু তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না বেশি দূর এগোতে। কারণ, তোমার দেয়া সীমাবদ্ধতায় আমার বসবাস।

পোস্টকার্ডে কখনো চিঠি লিখবে না। তোমার চিঠির একটি শব্দ, একটি অক্ষর অন্য কেউ পড়ে ফেলবে এটা আমি সইতে পারবো না।

আমার কাছে চিঠি লিখতে এতো দিরি কেন? চিঠিতে তুমি অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কথা লিখলে আমার দারুণ হিংসা হয়। চিঠিতে অন্য কারো প্রতি প্রশংসা কিংবা আগ্রহ প্রদর্শন আমাকে অবহেলার উদাহরণ।

তোমার বাসায় শিগগিরই আসছি। তুমি নিজ হাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করলে উপকরণ বাড়বে না। শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোতে তোমার কথা ভাবতে বসে অন্যমনস্ক হৃদয়ের আবেগটা, ভাবনাগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে আরও এলোমেলো করে দিচ্ছে।

আমার চিঠির কোনো অংশের ব্যাপ্তি কিংবা প্রাপ্তি তোমার জন্য কষ্টের কারণ হলে, আমার শব্দ বিন্যাস তোমাকে মুক্তি দেবে। পেছনে ফেরার অভ্যাস আমার নেই।

সেদিন এতোটা রেগে না গেলেও পারতে। তুমি আমার দুঃখগুলো বুঝতে পারো, কষ্টগুলো নয়। তোমার এই ধরনের আচরণ আমাকে দারুণ আহত করে। তুমি ছাড়া যে নিঃসঙ্গতা জাগে সেই নিঃসঙ্গতায় নির্জনতা আরো বেশি বেমানান।

*তোমাকে ঘিরে ভাবনাগুলো রায়*
*হ–য–ব–র–ল হয়ে যায়,*
*আমি জানি, তুমি বুঝতে পারো*
*তবুও যেন নীরবতা শোভা পায়।*

প্রশ্নোত্তর পর্বে না–ইবা গেলাম। রিক্ত উত্তরপত্রে শুধু নামটা লিখলাম। আমার অনেক শব্দের ব্যাপ্তি তুমি বুঝতে পারো না। কারণ, রোবটের বোঝার ক্ষমতা থাকে না। আমার মন খারাপ হয় যখন তুমি *অবহেলা* শব্দটি পাঠ করতে দিয়ে অন্যের কথায় মুগ্ধ হও।

তুমি হয়তো শ্রোতা হিসেবে বক্তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারো না। ভালোবাসা দিবসে এখানেই আমার ব্যর্থতা আর তুমি অপরাজিতা। সময়ের প্রয়োজনে চাই সাময়িক বিরতি। যদিও পূজারিণী করবে না আরতি। ক্ষমা করো প্রিয়তমা, আমার যতোটুকু পারো যতোটা দায়। শুধু মনে রেখো, খুব বেশি ভালোবাসি তোমায়।

*বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, থেকে*

## গরম পানি

– খাসরু

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। রাত বারোটা। ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

১৪ তারিখের উন্মাদনা সবার মাঝে। সবাই মেয়েদের হলে যাবে। কে কিভাবে বান্ধবীদেরকে সেলিব্রেট করবে তার পরিকল্পনায় মহাব্যস্ত। এতো রাতে মেয়েদের তো আর বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। তাই হল গেটে সবাই জড়ো হতে লাগলো।

এরই মাঝে কয়েকজন হল গেটের তালা ভাঙার মহান দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করতে থাকলো। কেউ আবার অন্তর্বাস পরে মিছিলও করলো। এতোকিছুর পরও মেয়েরা হলের ছাদ থেকে শুধুই হাসছিল।

রাত যতো গভীর হলো, ঘটনার ততো বৈচিত্রও এলো। মেয়েদেরকে উত্তেজিত করার জন্য কয়েকজন গরম পানি পলিথিনে ভরে উপরের দিকে মারতে লাগলো।

শান্ত মেয়েরা এতোক্ষণে আর চুপ রইলো না। বিপরীত দিক থেকে গরম পানির পাল্টা আক্রমণ ছেলেদেরকে একেবারে নিরাশ করলো।

কেউ কেউ শীতের দিনে গরম পানির উষ্ণতায় আরো বেশি উত্তেজিত হলো। মৃদু দুর্গন্ধে কয়েকজন বমি করলো। বাকিরা হলে এসে গোসল করলো।

তিন বছর পর আজও আমার জানা হলো না এতো গরম পানির জোগান হলো কিভাবে?

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# প্রেম করুন! পুরস্কার জিতে নিন!!

– মোছাম্মৎ চৈতী ফারজানা ক্ষণিকা

প্রেম একটি অনন্য সাধারণ ও আকর্ষণীয় খেলা। এ খেলায় অংশ নিলেই পুরস্কার প্রাপ্তি নিশ্চিত। পৃথিবীটা প্রেমরাজ্য। প্রেমে ভরপুর এ দুনিয়ার আকাশে–বাতাসে মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে প্রেম ভেসে বেড়াচ্ছে আপন গতিতে। তাই প্রেমরাজ্যে সবার উচিত চুটিয়ে প্রেম করা।

*প্রেম করলে হাজি, না করলে পাজি* এটাই হওয়া উচিত প্রেমিক–প্রেমিকার মূল দর্শন। প্রেম হচ্ছে সঞ্জিবনী সুধা যার স্পর্শে ভাগ্যবান হয় ভাগ্যহীন, হতভাগা হয় হতোদ্যম আর কুরূপা রমণী হয় সৌন্দর্যের আধার।

প্রেমের স্পিন ও গুগলি বলে ধরা হয় সরা, অন্ধকার পৃথিবী উদ্ভাসিত হয় আলোয়। প্রেমের ফাদ পাতা ভুবনে। এল.বি, কট বিহাইন্ড, বোল্ড হয় তাবৎ প্রেমিককুল। প্রেমের কাদামাটিতে মাখামাখি করে আপ্লুত হয় প্রেমিক যুগল। প্রেমহীন মানুষ পশুর সমান, প্রেমের স্পর্শে সোনা হয় কয়লা আর কয়লা তখন শতবার ধুলেও ময়লামুক্ত হতে পারে না।

প্রেম করলেই পুরস্কার, এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। আমাদের এই আকর্ষণীয় ও অনন্য সাধারণ প্রতিযোগিতায় সকলকে সাদর আমন্ত্রণ।

**প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী**

প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বয়স, পেশা, নির্বিশেষে সবাই ওই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যে প্রতিযোগী যতো কম সময়ে যতো বেশি সংখ্যক প্রেমিক–প্রেমিকা যোগাড় করতে পারবেন তার মূল্যমান ততো বেশি হবে। কোনো লাল, নীল, হলুদ বা সবুজ কার্ড নেই। ফৃ স্টাইলে *প্রেম প্রেম* খেলা চালানো যাবে।

**প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলো**

প্রথম পুরস্কার : দেবদাস অথবা পার্বতী হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি।

দ্বিতীয় পুরস্কার : এসিডে ঝলসানো মুখ, প্রেশার, হার্ট অ্যাটাক।

তৃতীয় পুরস্কার : পেপটিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক, অনিদ্রা।

চতুর্থ পুরস্কার : টেনশন, ছলনা, অপহরণ।

পঞ্চম পুরস্কার : মানসিক অস্থিরতা, প্রতারণা, ছলচাতুরি।
ষষ্ঠ পুরস্কার : মানসিক হাসপাতালে গমন।
সপ্তম পুরস্কার : বিয়ের আশ্বাসের দ্বারা কৌমার্য অপহরণ।
অষ্টম পুরস্কার : খোচা খোচা দাড়ি, চোখর নিচে কালি।
নবম পুরস্কার : অহরহ মিথ্যা ভাষণে এক্সপার্ট হওয়ার গ্যারান্টি।
দশম পুরস্কার : পড়াশোনা, স্বাভাবিক কাজকর্ম শিকেয় ওঠা।
এগারো. বিশেষ পুরস্কার : ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যু, মরণ।
বারো. সান্ত্বনা পুরস্কার : মামলা–হামলা–গণ্ডগোল, আত্মীয়স্বজনদের চোখের জল।

**প্রতিযোগিতা বিষয়ক অন্যান্য তথ্যাবলী**

মোট পুরস্কারের দাম : ৪২০।
প্রতিটি টিকিটের দাম : ৬৯ (ছয়নয়, নয়ছয়)
যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিযোগী : বাংলাদেশের প্রেম–পিয়াসী তরুণ–তরুণী, ইচেড়পাকা টিনএজার, ভীমরতি ধরা, বুড়ো শালিকরা।
প্রতিযোগিতার স্থান : নির্জন স্থান, পার্ক, সিনেমা হল, অভিভাবক শূন্য গৃহকোণ, অন্ধকার নিরিবিলি যে কোনো জায়গা।
টিকিট প্রাপ্তি স্থান : I love you centre. দেবদাস নগর, পার্বতীপুর।
প্রধান অতিথি : প্রেম বিশেষজ্ঞ P.hd in ancient love, শিরি–ফরহাদ জুটি।
বিশেষ অতিথি : প্রেম ভাস্কর খেতাব প্রাপ্ত ভালোবাসা কনসালটেন্ট দেবদাস–পার্বতী জুটি।
প্রধান বক্তা : প্রেম শিরোমনি, প্রেমরত্ন ইউসুফ–জুলেখা জুটি।
বিশেষ বক্তা : প্রেম গ্যালাক্সি, প্রেম নক্ষত্র চণ্ডিদাস–রজকিনী জুটি।
বিচারকবৃন্দ : চিরন্তন প্রেমের প্রতিমূর্তি রোমিও–জুলিয়েট জুটি।
পুরস্কার প্রদান করবেন : শুচিস্মিতা, প্রগতিবাদিনী, সর্বগুণ সমন্বিতা, পুরুষ চিত্তে পদ্মার ঢেউ সৃষ্টিকারিণী, তন্বী তরুণী, চোখের চাহনিতে মিসাইল নিক্ষেপকারিণী, আধুনিক রোমিওদের অত্যাধুনিক জুলিয়েট, তাফালিং ও টাংকি সম্রাজ্ঞী মো.চৈ.ফা. ক্ষণিকা।
প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র : *আতোভা* (আমি তোমায় ভালোবাসি) অডিটোরিয়াম। উরুসন্ধি সিমি ভিলা, সঙ্গমপুর।
প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ : ছ্যাকামাইসিন ইনজেকশন, কিসমাজল ট্যাবলেট। ফাকিং বি কমপ্লেক্স সিরাপ, লাভ মি টাচ কৃম।

**প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী সঙ্গীত**

*প্রেম সত্য, আর সব মিথ্যা, প্রেম ছাড়া গতি নেই।*
*প্রেম করে ছ্যাকা দিলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই।*
বিশেষ বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :
Milk Mountain Centre
Kissing Plaza
69 Forget Me Not Avenue
Love City.

**বিশেষ পাদটীকা**

*ভালোবাসা ছাড়া আর আছে কি?* কিছুই নেই। ভালোবাসা মানে Love. Love মানে Loss of valuable energy. সত্যিই কি তাই? Love মানে তো Life offers valuable energy হতে পারে যদি সত্যিকারের ভালোবাসা যায়।

ভালোবাসা দিবস আমাদের জীবনে বয়ে আনুক ভালোবাসার স্বর্গীয় সৌন্দর্য, পৃথিবী আলোকিত হোক ভালোবাসার আলোচ্ছটায়।

*ইন্দিরা রোড, ঢাকা থেকে*

# যন্ত্রণা

– রঞ্জু

প্রচণ্ড ভালোবেসে বারো বছর আগে সংসার, সমাজ সব তুচ্ছ করে যে মানুষটাকে বিয়ে করেছি সে আজ আমার দুই মেয়ের বাবা। তাকে নিয়েই আমার এই লেখা।

দুই মেয়ে নিয়ে এই মানুষটার সঙ্গে যে ঘরে আছি সেটা ঘর না, একটা নরক। মানুষের রূপ যে কিভাবে বদলায় তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ আমার স্বামী। বিয়ের পর থেকেই আস্তে আস্তে তার আসল রূপ বের হতে থাকে।

রাত করে বাড়ি ফেরা। অকারণে সবার সামনে চিৎকার, চেচামেচি করা, আমাকে তুচ্ছ করে কথা বলা তার কাছে যেন কোনো ব্যাপারই না। বিয়ের পর থেকে বাচ্চা চাইতো। ভাবলাম, বাচ্চা নিলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না। ঠিক তো হলোই না বরং উল্টো হয়ে গেলো। আসলে বাচ্চা নিয়ে আমাকে তার মুখাপেক্ষী করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তাই এখন গায়ে হাত ওঠাতে, জিনিসপত্র ছুড়ে মারতে একটুও তার হাত আটকায় না।

যৌথ পরিবারের বৌ আমি। সবার সামনে যখন এমন করে তখন ইচ্ছে করে মরে যাই।

গত দুবছর থেকে আমাদের কোনো ব্যাপারই সে জানে না। আমাকে হাত খরচের টাকা দেয়া দূরে থাক, বাচ্চাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে আনতে রাজি না। যৌথ পরিবারে আছি বলে হয়তো বাচ্চাদের নিয়ে আমার দুবেলা খাবার জোটে। অবশ্য আমাদের নিয়ে চিন্তা করার সময়ও তার নেই। সারা দিন আড্ডা আর অন্য মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতেই তার সময় চলে যায়।

লজ্জা, অপমান আর সংসারের অশান্তির ভয়ে কিছু বলতেও পারছি না, সইতেও পারছি না। বিয়ের সময়ের আমার যে ছোটখাটো গয়না ছিল তা বিক্রি করে আমার আর বাচ্চাদের না হলেই নয় এভাবে চলছি।

ম্যাট্রিকের আগে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর খুব চেষ্টা করেছে আমার পড়াশোনা বন্ধ করতে। আমি এক প্রকার যুদ্ধ করেই বিএ পাস করেছি। ভেবেছি একটা কোনোমতে চাকরি জোগাড় করে নেবো।

সে তাও হতে দেবে না। কড়াভাবে বলে দিয়েছে, চাকরি যদি করতে হয়, এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া মফস্বলের পরিচিত বাড়ির বৌ আমি। এদের জন্য আমাকে চাকরি দেয়ার সাহস কেউ করবে না। হেন আচরণ নেই যা সে আমার সঙ্গে করে না। তারপরও সমাজ সংসার সব ভেবে সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এখন অপমানের চূড়ান্ত করলো আমাকে আলাদা করে দিয়ে।

আমরা একই ছাদের নিচে আলাদা ঘরে থাকি। গত দুবছর আমরা এভাবেই আছি। শ্বশুরবাড়িতে একটা আজব প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। পাড়া-প্রতিবেশীরা বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে দেখতে আসে। ইনিয়ে-বিনিয়ে এটা-সেটা বলতে চায়, বাচ্চাদের বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করতে চায়। তখন ইচ্ছে করে কোনো একদিকে ছুটে পালিয়ে যাই।

ওর এ রকম আচরণ দেখে তার মনের কথা জানার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিয়ে যখন বলেছি, এভাবে তো সংসার হয় না, ডিভোর্সের ব্যবস্থা করলেই পারো।

সে অবাক করে দিয়ে বলে, ডিভোর্স আমি দেবো না। দিলে টাকা পয়সার ঝামেলা আছে। ওসব পোহাতে পারবো না। তুমি চলে গেলে চলে যাও। আর যদি আমার কাছ থেকে চাও, তাহলে স্ট্যাম্পে সই দাও, আমি ডিভোর্স দিলে তুমি কোনো মামলা করবে না, টাকা–পয়সার দাবি করবে না তাহলে আমি রাজি।

তার এসব কথা শোনার পরও এই সংসারে পড়ে আছি। কারণ, আমার যে যাবার কোনো রাস্তা নেই। সব রাস্তাই আমার বন্ধ। নিজেরও কোনো ব্যবস্থা নেই যে, বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা থাকবো। কঠিন এই সংসারে তিনজনের দায়িত্ব কেউ–ই নিতে চাইবে না।

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হলো আমার মতো ভুল কেউ যেন না করে। অল্প বয়সে ভালোবেসে বিয়ে যেন না করে। সময় নিন, মানুষটাকে ভালোভাবে বুঝুন, যাচাই করে নিন। তারপর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিন। কারণ, বিয়ের পরে আজীবন যন্ত্রণা পাওয়ার চেয়ে বিয়ের আগে ভুলে যাওয়ার সাময়িক কষ্ট অনেক ভালো।

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# দিন যায়

## তাকে ছাড়া প্রথম দিন

চার বছরের উথাল–পাথাল ভালোবাসার পর ও সেদিন আমাকে জানালো যে, সে আর আমাকে ভালোবাসে না।

সেদিন আমার অনুভূতিগুলো কেমন যেন ভোতা হয়ে গিয়েছিল। এমন এক জগতে পৌছে গিয়েছিলাম যেখানে কোনো কষ্ট নেই। কোনো আনন্দও নেই। কোনো চিন্তা নেই। আসলে কোনো চেতনাও নেই। আমি বোধহয় মৃত্যুর খুব কাছাকাছি কোনো জগতে পৌছে গিয়েছিলাম। আমার চোখে কোনো কান্না ছিল। কিন্তু কোনো আলোও ছিল না। চার পাশ কেমন ধোয়াটে বোধ হচ্ছিল।

যে ঝলমলে বিকেলগুলোতে তাকে পাশে নিয়ে ধানমন্ডির লেকে কাটিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে রকমই একটি বিকেলে, যখন সে আমাকে জানালো চরম সত্যটা তখন সেই ঝলমলে বিকেলেই আমার কাছে হয়ে উঠলো যেন পৃথিবীর সর্বশেষ দিনটি।

চার পাশে শুধু ধোয়া এবং ধোয়া। কোথাও কেউ নেই। কিছু নেই। সে আর আমার নেই। সে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই বোধটাও যেন আমার ছিল না। আসলে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর এক সময় সে চলে গেল। পেছন ফিরে তাকালো না।

আমিও উঠলাম। আমি হাটছি আর হাটছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। সামনে কি আছে জানি না। আমার শরীরটা যেন প্রাণহীন এক জড় বস্তু। জীবনকে হারিয়ে ফেলাই তো মৃত্যু, তাই না?

হাটতে হাটতে এক সময় বাস্তবে ফিরে এলাম। আমার চোখ ছিল চলন্ত বাসের চাকার দিকে। ইচ্ছা হচ্ছিল দাড়িয়ে যাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, সে তো চলেই গেল! সেকি ফিরে আসবে রাস্তায় আমার নিথর দেহটাকে দেখার জন্য?

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সঙ্গে তো সে নেই যে রাত হলে ঘরে পৌছে দেবে।

চেতনে না, অচেতনে জানি না, একটা সিএনজি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। বাসায় তখন কেউ ছিল না। আমার মনটাও তখন শূন্য।

আসলে সব হারানোর কষ্ট তখন বোধহয় কষ্টের সীমানা বা থ্রেশহোল্ড (Threshold) পেরিয়ে গেছে। তাই সে আর আমার নেই। এই সত্যটা তখন আমার ব্রেনকে স্টিমুলেট করতে পারছিল না। মাথাটা কেমন ফাকা, বোধ শক্তিহীন...। চোখে একটুও কান্না নেই।

চোখটা চলে গেল ফ্যানের বুকের দিকে। সে এক অদ্ভুত অবস্থা।

আমি এখন বুঝি কেন এতো অসংখ্য বোকা ছেলেমেয়ে প্রিয় মানুষকে না পেয়ে জীবনটা হঠাৎ শেষ করে দেয়। সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাও সে রকমই ছিল। সে যখন আমার নেই। তখন আমার আর কি থাকলো!

একটুও কান্নাকাটি না করে চেয়ারটা আনলাম ফ্যানের নিচে। ওড়নাটা হাতে নিলাম। তার মুখটা ঝাপসা মনে পড়লো। মনে পড়লো তার শেষ কথাগুলো। আমার পৃথিবী তখন টলায়মান। আমি চলে যাচ্ছি। সে কি এরপরও আসবে না আমাকে দেখতে? আমার জন্য কি সে কাদবে না?

ফ্ল্যাশব্যাকের মতো করে মনে পড়ে যাচ্ছিল তার সঙ্গে কাটানো এক একটা দিন, এক একটা মুহূর্ত। মনে পড়ছিল তার এক সময়কার ভালোবাসা আবার মনে পড়ছিল শেষ মুহূর্তে তার ভাবলেশহীনতা।

আমি চেয়ারে উঠলাম। ওড়নাটা আমার হাতে। লম্বায় ওড়নাটা ফ্যানের হুক ছোবে কি না চিন্তা করছি। ঠিক সেই মুহূর্তে কলিংবেল...। মায়ের গলা।

আমার যাওয়া হলো না।

আসলে মৃত্যুও আমাকে নিল না।

তাকে ছাড়া কিভাবে বাচা যায় সেই অনুভূতিটাও যে আমার পেতে হবে। তাই আমি বেচে রইলাম।

## তাকে ছাড়া দ্বিতীয় দিন

ভেবেছিলাম রাতে ঘুম হবে না। সারাটা রাত বোধ হয় কাদতে কাদতেই যাবে। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি, সেই রাতে ঘুম হলো আমার। গভীর ঘুম। স্বপ্নেও এলো। আমরা হাত ধরে হাটছি আর হাটছি... সেই আগের মতো।

ঘুম ভাঙলো। বুকটা কেমন খালি, ফাকা। ভালোবাসার অবস্থান আসলেই হৃদয়ে। জানি না ব্রেইন সেটা কনট্রোল করলেও আমার বুকের ভেতর সেদিনের সেই অসীম শূন্যতার আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

বাসার কাউকেই বুঝতে দিলাম না যে, আমার সব কিছুই হারিয়ে বসে আছি। হসপিটালে গিয়েছি, রোগী দেখছি। কিন্তু এবার মনে হলো, আমার ব্রেইন সিগনাল পেতে শুরু করেছে যে, সে আর আমার নেই।

একটু পর পর তার মুখ মনে পড়ছিল আর দমকে দমকে কান্না। এই কান্না উঠে আসছিল বুকের গভীর থেকে। কি কষ্ট, কি ভীষণ সেই কষ্ট...!

মোবাইল ফোন বাজে। আমি চমকে উঠি। এই বুঝি সে ফোন করলো। এই বুঝি সে বললো, ডিয়ার, আই লাভ ইউ।

কিন্তু প্রতিবারই অন্য কেউ। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় কালকের বিকেলটা কি সত্যিই ছিল, নাকি দুঃস্বপ্ন ছিল?

আমি কাজ করছি, চলছি, ফিরছি। কিন্তু কি এক ভয়ংকর শূন্যতা আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আমি ডুবে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি।

এক সময় কাজ শেষ হলো। ঘরে ফিরবো এবার। মনের অজান্তেই চোখ চলে গেল সেই জায়গাটায় যেখানে সে দাড়িয়ে থাকতো আমার জন্য। আমার মন চাইছিল দেখতে তাকে। যেন সে এসে বলবে, আমি দুষ্টুমি করেছি।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

ওহ! আমার চার পাশে এতো শূন্যতা কেন?

আমি বাসে উঠলাম। আমার চোখ সারাটা পথ শুধু একজনকেই খুজছিল যদি সে আসে আমাকে নেয়ার জন্য? আমার মন মানতেই চাইছিল না যে, সত্যিই তাকে হারিয়েছি। প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে ছ্যাকা খাওয়া।

**তাকে ছাড়া তৃতীয় ও পরের দিনগুলো. ..**

দিন যায়, অপেক্ষায় থাকি। ছ্যাকা খাওয়া মানুষের মনের অনুভূতি বোধহয় এ রকমই হয়। এক সময় প্রচণ্ড রাগ হয় তার প্রতি। এক সময় প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে, এতো ঘৃণা নিয়েও তার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করি। আসলে আমার ভালোবাসাটা তো সত্যি ছিল, এতো রাতারাতি উধাও হয়ে যাওয়ার মতো নয়!

মানুষের সহ্য ক্ষমতা অসাধারণ। যাকে একদিন না দেখলে অস্থির লাগতো। মনে হতো তাকে ছাড়া বাচবো না। এখন তো দিব্যি বেচে আছি যদি একে বাচা বলে!

এভাবেই হয়তো আমার জীবনটা কেটে যাবে। সেই মুহূর্তে যখন মরতে পারিনি তখন। এখন আর আত্মহত্যার কথা ভাবি না।

আমি শুধু একটিবার তার মুখোমুখি হতে চাই। তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমি কি এতোটাই খারাপ একটা মেয়ে ছিলাম যার সঙ্গে চার বছর প্রেম করা যায়, অথচ জীবন কাটানো যায় না। আর তার ভালোবাসাটাই বা কি রকম যেটা উধাও হয়ে যায়!

এতো সহজে ভালোবাসার মৃত্যু হয় এটা বিশ্বাস করতে একদম ইচ্ছা হয় না।

*নাম ঠিকানা বিহীন*

# জয়ী

– মাহমুদুল হক শাহ

চারদিকে কোথাও ভাঙতি না পেয়ে জাভেদের দিকে তাকালো জয়া।

ভাইয়া, ভাঙতি হবে?

জাভেদ মানিব্যাগ দেখলো। না। দশ টাকার পুরো ভাঙতি হবে না।

আপনার কতো লাগবে?

রিকশা ভাড়া পাচ টাকা।

জাভেদ কোনো কথা না বলে তিনটি দুই টাকার নোট দিল।

জয়া ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল কোনো কথা না বলে।

কিছুক্ষণ পর।

জাভেদ বই রেখে বিশ্রাম নেবে। টেবিলের দিকে নজর এলো। একটি দশ টাকার নোট। বুঝতে বাকি রইলো না এটা কার। জয়া ইচ্ছা করেই না বলে এটা রেখে গেছে। জাভেদ কিছুটা বিব্রত হলো। মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় নেই। আজই প্রথম কথা হলো। কি করা যায়?

লাইব্রেরিয়ান ব্যাপারটা আচ করতে পেরে সাহায্যের হাত বাড়ালেন। নোটটি জয়ার কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন।

জাভেদ হাপ ছেড়ে বাচলো।

কয়েকদিন পর আবার দেখা। এবার রুদ্র মূর্তি।

এটা কি হলো?

মানে? কি বলছেন? জাভেদের অসহায় জিজ্ঞাসা।

টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন কেন?

জাভেদ খুব লাজুক। কোনো বাক্য ব্যয় না করে টাকাটা ফেরত নিল। বই গুছিয়ে লাইব্রেরির বাইরে চলে এলো।

একটু পর জয়াও বেরিয়ে এলো। দুজনেই রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল কোনো কথা ছাড়া।

জয়া নীরবতা ভাঙলো। আপনি কি রাগ করেছেন?

না।

জাভেদের কথার দৃঢ়তায় জয়া আর কথা বাড়ালো না। গন্তব্যের দিকে হাটা শুরু করলো। রিকশা না পেয়ে জাভেদও ভাবছে হেটে যাবে। কিন্তু দুজনের দিক একই হওয়ায় সে একটু দেরি করছে। জয়া আরেকটু এগিয়ে যাক, তার পরেই সে এগোবে। আর রিকশা পেলে তো কথাই নেই। এদিকে ঘড়ির কাটার দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির। না। এবার তো হাটা শুরু করতেই হয়।

চৌরাস্তার মোড়ে নিজের নাম শুনে জাভেদ ফিরে তাকালো।

জয়া! একটি ফুলের দোকানের পাশে দাড়িয়ে। সে এগিয়ে গেল।

আপনি কি মন খারাপ করেছেন? জয়ার কণ্ঠে অপরাধ বোধ।

না।

তাহলে কথা বলছেন না কেন?

কি বলবো?

যা সত্যি তাই।

টাকাটা ফেরত দিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। যাহোক, টাকাটা কাজে লাগাবো। এতে করে কারো কোনো আক্ষেপ থাকবে না।

কিভাবে?

যদি আপনাকে একটি গোলাপ দিই, আপনি নেবেন?

একটি কেন? চোদ্দটি নয় কেন।

জাভেদ পাশের দোকানে ঢুকলো। চোদ্দটি গোলাপ নিয়ে এলো। হঠাৎ মুখ ফশকে বেরিয়ে এলো, গুণে নাও।

ভালোবাসার ফুল কখনো গুণতে হয় না। জয়ার মুখে লাজুক হাসি।

জয়া তুমিই জয়ী। এবার জাভেদের গম্ভীর মুখেও মিষ্টি হাসি।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## বলদ

– মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বাদশা

বাজারের শেষ প্রান্তের দোকানটি জহিরের। হাট–বাজারের সময়টুকু ছাড়া এ এলাকায় মানুষের আনাগোনা অপেক্ষাকৃত কম। দোকানের পেছনের দরজার একটু পরেই একটি পাড়া। এ পাড়ার বৌ, ঝি–রা মাঝে মধ্যে জহিরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তেল–লবণ কিনে থাকে। এ সুবাদে সেতুর সঙ্গে জহিরের যথেষ্ট যোগাযোগ।

শ্রাবণে একদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল। বাজারের ভেতরের কয়েকটা ছাড়া বাকি দোকানই প্রায় বন্ধ। হঠাৎ জহিরের বন্ধ দোকানের পেছনের দরজায় করাঘাতের শব্দ। জহির বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দেখে ছাতা মাথায় সেতু। তার চোখে কিসের যেন ক্ষিধে। তার চোখের ভাষার প্রত্যেকটি শব্দ অক্ষরে অক্ষরে জহির পড়তে পারে।

কি লাগবে?

লবণ।

এসো দিচ্ছি।

দরজা বন্ধ করে এক ঘণ্টা ভরে জহির তাকে লবণ দেয়। সেতুর মতো অনেককেই এ রকম লবণ জহির দিয়েছে, এমনকি ক্রেতাকে উল্টো টাকা দিয়েও। আর সেতুও অনেকের কাছ থেকে গোপনে কিনেছে। সে জন্য কারোই পা কাপে না।

কিন্তু টুটুলই একমাত্র নতুন দোকানদার যে কি না লবণই মাপতে শেখেনি আজও।

বান্ধবীরা বলে, আরে রাখ, রাখ, তোর ইচ্ছে পূরণ হবে না।

সেতু শুধু বলে, সময়ই বলে দেবে দেখিস।

কোনো কোনো সময় রাস্তায় টুটুলকে ক্রস করার সময়ে সেতুর মুখ থেকে একটি মৃদু শব্দ বেরিয়ে যায়, *কাপুরুষ*।

টুটুলের মাথাটায় ঝিম ধরে যায়। একবার শালা বাগে পেয়ে নিই, দেখবো মজা! এ তার রাগের কথা। আর এটা যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হতো তবে সে হয়তো সেতুর কাছে জহিরের মতো থাকতো।

একদিন বুড়ির মেলায় সেতু–টুটুলের মাঝে কথা হয়। পেয়াজু–চানাচুর দেয়া–নেয়া হয়। তারপর থেকে গোপনে কথা হয়, জন্মদিনে গিফট দেয়া হয়, ঈদ কার্ড দেয়া হয় ইত্যাদি।

শহরের মানুষগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের মানুষেরও ভ্যালেনটাইনস ডে–তে ঘটা করে ভালোবাসা প্রকাশ করতে শিখেছে। তাদের অনেকে এদিনে বিয়েও করে! তবে স্টাইল কিছুটা ভিন্ন হতে পারে এই যা।

গত বছর ভ্যালেনটাইনস ডে–তে বেলা বারোটার মধ্যেই সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে যে, নৈমুদ্দির বাড়িতে সেতু আর টুটুল ধরা পড়েছে।

দৃশ্যটা ছিল এ রকম : ঘরের দরজা ভেড়ানো। খাটের ওপর দোতলা হয়ে দুজন মানুষ। নিচে সেতু। গলা পর্যন্ত তার জামা উঠানো। দুজনের পা মাটিতে।

টুটুল কাপছিল, মনে হচ্ছিল তার হিতাহিত জ্ঞান নেই। এ সময় কেউ একজন ঘরের শিকল বন্ধ করে দেয়। ব্যস, সালিশের মাধ্যমে এই শিকল দুজনের সারা জীবনের বন্ধনে পরিণত হয়।

বন্ধু মহলে পরে টুটুল বলেছে, ঘরের ভেতরে আলাপকালে সেতু তাকে বলেছিল, বলদ।

কি বললা, আবার বলো।

বলদ।

আবার বলো দেখি।

বলদ।

পুরুষত্ব দেখাতে সে ঝাপিয়ে পড়ে সেতুর ওপরে।

পরে আজীবনের পরিণতি।

সেতু একটা সৎ চরিত্রের ছেলেকে দুর্নামের মধ্য দিয়ে পেল। জহিরও হয়তো কোনো ভ্যালেনটাইনস ডে–তে কোনো ভালো মেয়েকে ভালোবাসার ভাষা শিক্ষা দিয়ে নিজের করে নেবে। যদি অভিজ্ঞতার স্পর্শে সেতু ও জহিররা নিরক্ষরতাকে জয় করে, তাহলে টুটুলদের কি লাভ?

টুটুলরা হয়তো সত্যিই বলদ।

*ঢাকা থেকে*

# আমার মল্লিকা বনে

– কিউ.এম. রহমান

অনেক দিন ধরে দুবাই শপিং ফেস্টিভাল দেখার ইচ্ছা থাকলেও তা কখনো হয়ে ওঠেনি। ২০০২ সালের মার্চে যখন লন্ডন যাই তখন এই মেলা দেখার জন্য দুবাই–তে দুদিনের যাত্রা বিরতি নিই।

এমিরেটস এয়ারলাইনস যখন দুবাইতে পৌছেছিল তখন প্রায় বিকেল। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সেরে হোটেলে পৌছাতে অনেক সময় লাগলো। চেক ইন করার সময় জানতে পারলাম যে, হোটেল থেকে প্রতি আধা ঘণ্টা অন্তর অন্তর গেস্টদের ফেস্টিভালে নিয়ে যাওয়া ও আসার ব্যবস্থা রয়েছে কোনো রকম চার্জ ছাড়াই।

নিশ্চিন্ত মনে রুমে গিয়ে একটা ঘুম দিলাম। ঘুম যখন ভাঙলো তখন রাত। জানালা দিয়ে দেখলাম বাইরে ঝলমলে দুবাই নগরী। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে মেলার উদ্দেশে হোটেলের গাড়িতে রওনা হলাম।

দুবাই শহরের মাঝখান দিয়ে যে কৃক (Creek) বা খাড়ি বয়ে গেছে তারই এক পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে এই মেলা বসেছে। শুধু যে এই জায়গাটুকু তা নয়, বরং এ জন্য সারা দুবাই শহর রঙিন বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। শপিং মল, হোটেল, রেস্তোরা, মেলা সব জায়গায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। এ সময় সারা দুনিয়া থেকে লোক এখানে বেড়াতে আসে। দুবাই–এর বর্তমান শাসক শেখ মোহাম্মদ এই মেলার উদ্যোক্তা। পৃথিবীর নানান অংশের মানুষের *মিলন মেলা* বলে তিনি এর নাম দিয়েছেন *গ্লোবাল ভিলেজ।*

মেলায় ঢুকতেই গেটের পাশে প্রথমে চোখে পড়লো টয়োটা গাড়ির প্যাভিলিয়ন। এর পাশে রয়েছে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার ব্র্যান্ডের পোশাক ও প্রসাধনীর স্টল। এটি আমার প্রিয় ব্র্যান্ড হওয়ায় সবার আগে সেখানেই গেলাম। ঢাকাতে যেসব পোশাক হাতেগোনা দুই একটা দোকানে পাওয়া যায় এখানে তার বিশাল সম্ভার। পছন্দ করে নিজের জন্য দুটো শার্ট কিনলাম।

কাউন্টারে দাম পরিশোধ করে যখন বের হয়ে আসছি তখন অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটলো। শাড়ি পরা এক মহিলা সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে ফিরোজ বেয়াই না? কবে এলেন দুবাইতে?

এই শহরে কোনো মহিলা আমাকে চিনবেন তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তাই আমাকে অপ্রস্তুত দেখে নিজেই পরিচয় দিলেন, আমি মিলি। আপনার চাচাতো বোনের ননদ।

এবার চিনতে পারলাম। বললাম, সম্ভবত ত্রিশ বছর পর আপনার সঙ্গে দেখা। তাই হঠাৎ করে চিনতে পারিনি। সে সময় আপনি ছিলেন ফ্রক পরা এক মেয়ে আর আজ শাড়ি পরা এক মহিলা।

আমার কথা শুনে হেসে উঠে পেছনে দাড়িয়ে থাকা তার দুই মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। জানালেন বড় মেয়ে বিবিএ করে এবং এইচএসবিসি ব্যাংকে চাকরি করছে। ছোট মেয়ে ক্লাস এইটের ছাত্রী। দুই মেয়ে আর স্বামী নিয়ে তার সুখের সংসার। আরো একদিন দুবাইতে আছি জেনে পরদিন শারজাহতে তার বাসায় ডিনারের নিমন্ত্রণ দিলেন। বিদায় নেয়ার আগে কোন হোটেলে উঠেছি তা জেনে নিলেন।

মিলি বিদায় নেয়ার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেউ যেন হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগিয়ে গেল। যে মেলা দেখার জন্য এতো আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছিলাম তা মুহূর্তের মধ্যে স্তিমিত হয়ে গেল। মেলার আলো ঝলমলে পরিবেশ আর ভালো লাগলো না। বিষণ্নতা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। দেরি না করে বাইরে বের হয়ে একটা ট্যাকসি নিয়ে সোজা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সে সময় আমার এক চাচাতো বোনের বিয়ে হয়। এই বিয়ের পর আমরা বেশ কয়েকজন ভাই–বোন কুষ্টিয়াতে ওই চাচাতো বোনের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাই। সেখানে তাদের আরো অনেক আত্মীয়রা

এসেছিল। তার মধ্যে রাজশাহী থেকে এসেছিল আমাদের নতুন দুলাভাইয়ের এক মামাতো বোন। সে তখন ক্লাস সেভেন কি এইটের ছাত্রী। সামান্য তিন চার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

এক দিন রাতে ওই বাড়ির পুকুর ঘাটে বসে সে আমাকে শুনিয়েছিল *আমার মল্লিকা বনে* রবীন্দ্র সঙ্গীতটি। তারপরই তাকে আমার ভালোবাসার কথাটি বলেছিলাম।

উত্তরে সেও বলেছিল তার মনের কথাটি।

বস্তুত চোখের ভাষায় কয়েকদিন যে কথাটি হচ্ছিল সেই রাতে যেন তা মুখের কথায় পরিণত হলো। একটু আগে গাওয়া গানের রেশ ধরে তাকে বলেছিলাম, *তুমি আমার মল্লিকা বনে প্রথম ফোটা ফুল।*

যেদিন ওই বাড়ি থেকে চলে আসি সেদিন আমাকে মিলি তার একটা ছবি ও ঠিকানা দিয়েছিল। সাত দিনের মতো আমরা সেখানে ছিলাম।

বিরহ জিনিসটা কি সেই প্রথম টের পেলাম। অন্য সব প্রেম থেকে আসলে প্রথম প্রেমের রঙ, স্বাদ, গন্ধ পুরোটাই আলাদা। অনুভবটাও বোধহয় ব্যতিক্রমী। বাড়িতে আসার পর লুকিয়ে রাখলাম ছবিটা। তবে মাঝে মধ্যে বের করে দেখি। নিজের মনে নিজেই হাসি। এর মাঝে শুরু হলো চিঠি লেখার পালা। আমিও যেমন লিখছি, সেও তেমন উত্তর দিচ্ছে।

বিষয়টা কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির বড় থেকে ছোট কারোর আর জানতে বাকি থাকলো না। স্কুলে পড়া ছেলে প্রেম করে এই নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকলো অনেকেই। এমন মন্তব্যও করলো কেউ কেউ যে, বড় ভাই–বোনেরা তো এম.এ পাস করেছে। এর বোধহয় তা হবে না।

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছালো যে, সপ্তাহে অন্তত দুটো চিঠি পাঠাচ্ছি। অন্যদিকে সেও সমান সংখ্যক পাঠাচ্ছে। স্কুলের পড়াশোনার চেয়ে চিঠি লেখার মুসাবিদায় বেশি সময় ব্যয় হয়।

একই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বই পড়া শুরু করলাম যাতে করে সুন্দর ভাষা, বাক্য সেখান থেকে তুলে আনা যায়।

এভাবে কিছুদিন চলার পর চাচাতো বোন ও দুলাভাইকে জরুরি তলব করলেন আমার মা। আমাকে কিছু না জানতে দিয়ে তিনি ওই পক্ষকে শক্ত হাতে নিবৃত্ত করলেন। অচিরেই চিঠি আসা বন্ধ হলো।

আমিও লোকজনের তিরস্কারে যেন নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠলাম। যে গাছটি আলো, বাতাস ও পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল তা হঠাৎ করে শুকিয়ে গেল। যে ফুলটির সুবাস ছড়ানোর কথা তা পাপড়ি মেলার আগেই ঝরে গেল। তারপর আর কখনো যোগাযোগ হয়নি। বহু বছর পর শুনেছিলাম এইচএসসি পাস করার পর মিলির বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী মিডল ইস্টে চাকরি করে।

পরদিন রাত আটটার সময় মিলি আমাকে নিতে এলেন তার বাসায় ডিনারের জন্য। হালকা নীল রঙের শাড়ি পরেছেন। তার সঙ্গে ম্যাচ করে পরা ব্লাউজ, টিপ, এমনকি পায়ের স্যানডাল পর্যন্ত।

সঙ্গে স্বামী আসেননি দেখে তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

বললেন, তার সঙ্গে বাসায় গিয়ে পরিচয় হবে। আমি একাই আপনাকে নিতে এসেছি। বলতে বলতে বিশাল র‍্যাংলার জিপের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসলেন।

আমি তার পাশের সিটে বসলাম।

চমৎকার ড্রাইভ করেন মিলি। তার ড্রাইভ দেখছি আর ভাবছি, ভাগ্য মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়। মফস্বল শহরের একটা মেয়ে দেশে বিয়ে হলে যে আজকে হয়তো রিকশায় চলাচল করতো সে আজ চার হাজার সিসি–র আমেরিকান জিপ চালাচ্ছে! শুধু একটা টার্নিং পয়েন্টের কারণে জীবনের কি পরিবর্তন।

আমাকে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে মিলিই কথা বলা শুরু করলেন। বললেন, বিয়ের পর তারা বাহরেইন ছিলেন। পরে দুবাইতে আসেন। তার স্বামী দুবাইতে একটা বৃটিশ অয়েল কম্পানিতে চাকরি করেন। শারজাহতে বাড়ি ভাড়া তুলনামূলক অনেক কম হওয়ায় দুবাইতে না থেকে শারজাহতে থাকেন। প্রতিদিন তার

স্বামীকে শারজাহ থেকে দুবাই আসতে হয় সকালে। আবার কাজ শেষে সন্ধ্যায় ফিরে যেতে হয়। অবশ্য দুই শহরের দূরত্ব সামান্য পনেরো মিনিটের পথ যদি রাস্তায় জ্যাম না থাকে। আরো বললেন, চারজনের সংসারে তাদের তিনটি গাড়ি। প্রতি বছর একবার তারা ইওরোপ, আফৃকা অথবা আমেরিকা–তে বেড়াতে যান। অবশ্য তিন চার বছর পর একবার দেশেও আসেন।

মিলির বাসার সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পৌছানোর পর সবার আগে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হলো। ভদ্রলোক বেশ মিশুক এবং আমুদে প্রকৃতির। কথা বলেন বেশ মজা করে। খাওয়ার সময় মিলির মেয়েরাসহ এক সঙ্গে খেতে বসলাম।

ভদ্রলোক তার স্ত্রীর রান্নার সুনাম করতে ভুললেন না। আরো জানালেন, আজকের সব খাবারই তার নিজের হাতে রান্না করা।

ডিনার শেষে আবার শুরু হলো গল্প। এবার প্রসঙ্গ বিদেশ নয়, দেশ। দেশের রাজনীতি, শিল্প, পরিচিত মানুষ ইত্যাদি। ঘড়ির কাটা যখন রাত একটা পার হয়ে গেল তখন বিদায় চাইলাম।

আমাকে আবার হোটেলে পৌছানোর দায়িত্ব নিলেন মিলি। স্বামী ও দুই মেয়েকে ঘুমাতে বলে তিনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন।

আমি পাশে বসে আছি আর মিলি গাড়ি চালাচ্ছেন। কখনো একশ, কখনো বা তারও বেশি কিলোমিটার বেগে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শারজাহ থেকে দুবাইতে এসে পড়লাম। কিন্তু হোটেলের দিকে না গিয়ে আমরা অন্য রাস্তায় গেলাম।

মিলি বললেন, আজকে আপনাকে রাতের দুবাই শহর ঘুরে দেখাবো। কোনো অসুবিধা নেই তো?

বললাম, না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তবে আপনার বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

আমার ওপর স্বামী ও সন্তানদের অগাধ বিশ্বাস। তাছাড়া এ দেশে কোনো মহিলা রাতে বাইরে বের হলে তাতে ঘরের লোকের দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনো কারণ নেই। মিলি উত্তর দিলেন।

এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানতেন না যে, আমি দুবাই থাকি?

না।

কিন্তু আমি আপনার সব খবর রাখি। কি করেন, কোথায় বিয়ে করেছেন, কয় ছেলেমেয়ে। যখন দেশে যাই তখন সকলের খোজখবর নিই। মিলি বললেন।

তবে আমার কাছে একটা জিনিস খুব আশ্চর্য লাগছে। ত্রিশ বছর বড় দীর্ঘ সময়। এতোদিন পরে আপনি আমাকে দেখে হঠাৎ করে চিনলেন কি করে! জিজ্ঞাসা করলাম।

এর কারণ, আমি আপনাকে ভুলিনি। যখন মনে পড়তো তখন চেহারাটাও যেন সামনে আসতো। আমার এটুকু বিশ্বাস ছিল যে, একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবেই হবে। ত্রিশ বছর পর গতকাল যখন সত্যিই দেখা হলো তখন আমার আবেগকে উচ্ছ্বাসে পরিণত হতে দিইনি। তবে প্রাপ্তির আনন্দে কাল সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। ত্রিশ বছর আগের ঘটনাগুলো কাল রাতে বার বার সামনে এসেছে। কিন্তু কোনো কষ্ট পাইনি। এ স্মৃতি আমার সুখের। প্রথম প্রেমের আনন্দটুকু এখনো নিজের করে রেখে দিয়েছি। এ যেন বিয়ের বেনারসি শাড়ি। তাতে ধুলো–ময়লা জমলেও মাঝে মধ্যে ঝেড়ে–মুছে আবার সযত্নে রেখে দিই। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

কথা বলতে বলতে খেয়াল হয়নি যে আমরা দুবাই–এর অন্যতম অভিজাত এলাকা জুমাইরা বিচে এসে গেছি। ডান পাশে পারস্য উপসাগর, বাম পাশে দুবাই নগরী আর সামনে পাশাপাশি বড় হোটেল।

এর মধ্যে একটি হোটেল যার নাম *বারজেল আরব*। এটি আধুনিক দুবাই–এর অন্যতম গর্ব। এর স্থাপত্য নকশা ঐতিহ্যবাহী অ্যারাবিয়ান নৌকার পালের মতো করে বানানো হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সাগরের

বুকে যেন পাল তোলা নৌকা। কিছুক্ষণ পর পর এর রঙ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। লাল, তারপর কমলা, এরপর গোলাপি, তারপর হালকা নীল, এরপর গাঢ় নীল। বিভিন্ন রঙের বাতি দিয়ে আলো ফেলে পুরো হোটেল ভবনের রঙ এভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে। কি অপরূপ দৃশ্য!

মিলি তার গাড়ি রাস্তার পাশে থামালেন। দুবাইয়ের সব গাড়িই বাম হাতে চালিত। তাই সামনের ডান পাশের সিটে আমি বসেছিলাম। আমার বাম হাতটা গিয়ারের ওপর ছিল। হঠাৎ খেয়াল করলাম মিলি আমার হাতের ওপর তার হাতটা রেখেছেন।

আমার হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, জীবনে যেটা হয়নি সেটা হয়তো ভালোর জন্যই হয়নি। তা না হলে আজকে আপনি এই অবস্থানে আসতে পারতেন না। ত্রিশ বছর আগের সামান্য কয়েকটা দিনের স্মৃতি মনে রেখে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে ভুলে যাওয়াটা অনেক ভালো। আমি মনে করি স্বামী– সন্তান নিয়ে আপনি সুখে আছেন। আপনার যেখানে বিচরণ সে জগৎটা অনেক বিশাল। সেখানে ঐশ্বর্যের অভাব নেই। তাই ত্রিশ বছর আগের এক কিশোরকে ভুলে গেলে আপনার সুখের দিনগুলো কখনো ফুরাবে না।

ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় আড়াইটা বাজে। তাকে বললাম ফিরে যেতে।

আর কোনো কথা না বলে মিলি আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

ফেরার সময় বার বার শাড়ির আচল দিয়ে চোখ মুছতে দেখলাম।

*পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে*

# বিয়ের আগের রাত

– অদৃশ্য

এঞ্জেলা–কে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও না। তার বাড়িতে না হলেও পঞ্চাশ বার টেলিফোন করা হয়েছে। তার কাজের জায়গায় হানা দিলাম। না, কোনো লাভ হলো না।

তার বোন জিম–কেও মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে না। বার বার ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলছে, এই মুহূর্তে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় নেই। কি করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি চোখে সরিষার ফুল দেখছি। খুব ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কাউকে কিছু বলাও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এখানে সবাই *সাক্ষীগোপাল*। এঞ্জেলাকে খুজে বের করতেই হবে। এ সময় সেই আমার একমাত্র প্রয়োজন। কারণ, আগামীকাল আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা। কনট্রাক্ট ম্যারেজ বা চুক্তি বিয়ে।

এঞ্জেলাকে ইতিমধ্যে টাকা–পয়সা দেয়া হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে আমার জন্ম প্রত্যয়নপত্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সনদ, স্থায় ঠিকানার চেয়ারম্যানের সনদ আনা হয়েছিল অনেক আগেই। এখন তাকেই পাওয়া যাচ্ছে না যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তবে কি সে উধাও হলো সব টাকা পয়সা হাতিয়ে?

একের পর এক সিগারেট টানছি আর ভাবছি, মানুষ এতোটা অমানুষ হয় কিভাবে? রাত আটটা থেকে তাকে খুজছি। তাকে খুজে পাওয়া না গেলে পাগল হওয়ার একটা সমূহ সম্ভাবনা। কারণ, টাকার শোক নাকি ছেলের মৃত্যু শোকের চেয়েও বেশি। বলা প্রয়োজন, এটা প্রায় বিশ লাখ টাকার ব্যাপার। মামার হাতের মোয়া নয়!

এঞ্জেলা থাইল্যান্ডের মেয়ে। মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভালো। সুইটজারল্যান্ডের পাসপোর্টধারী। পেশায় বৈধ দেহ ব্যবসায়ী। গাড়ি, বাড়ি, কোনো কিছুর কমতি নেই। তার সঙ্গেই আমার চুক্তি বিয়ে হওয়ার কথা। কিন্তু তার হদিশ নেই। মনে মনে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করি। মাগি যদি একটা ফোনও করতো!

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। চার পাশের পাহাড়ের জমা বরফের ঠাণ্ডা। তারপরেও ঘামছি আমার অজানা ভবিষ্যতের আশংকায়।

বাবা মাকে কি বলবো? এদিকে আমার পারমিটের মেয়াদও শেষ পর্যায়ে। এদিক-সেদিক সম্ভাব্য সব জায়গাতেই হাক মারছি। তার পাত্তা নেই। মাঝে মধ্যে আমার ভগ্নিপতি আমাকে ফোন করছেন খবর নিচ্ছেন। তিনিও খোজ নিচ্ছেন তার। তিনিই আমার একমাত্র ভরসা এ সুইটজারল্যান্ডের মতো ব্যয় বহুল দেশে।

২০০২-এর মার্চে এমবিএ কোর্সে ছাত্র সাইনবোর্ড নিয়ে এ দেশে আসি পড়াশোনার নামে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য, সুইস ফ্রা রোজগার। সঙ্গে সুযোগ পেলে এ দেশের পাসপোর্ট হাসিল করে নেয়া। নিম্নস্তরের কাজ করছি সারা রাত জেগে। আট-নয় ঘণ্টা কাজ করে ছয় ঘণ্টার পারিশ্রমিক পাচ্ছি। এসব কাজ আমাদের দেশের একটা উচ্চ শিক্ষিত ছেলে কল্পনাও করে না। অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারও একই কাজ করছেন।

বলে রাখা ভালো, সুইটজারল্যান্ডের বেসরকারি ইউনিভার্সটিগুলো আমাদের দেশের স্কুলগুলোর চেয়েও আয়তনে ছোট। তারপরেও উন্নত দেশ বলে কথা! এখানে বৈধভাবে বসবাস করার যে দুই একটি উপায় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো বিয়ে করা। তাও কোনো সি-পারমিটধারী বা পাসপোর্টধারীকে। আমিও তা করতে গিয়েই ধরা খেলাম।

আমার শাদা-লাল রঙের *মার্লবরো মিডিয়াম* প্যাকেটে আর মাত্র একটি শলা সিগারেট বাকি। আমি হাটছি রু ডি বার্ন দিয়ে সেখানে এঞ্জেলা কাজ করে। এভাবে কি মানুষ খুজে পাওয়া যায়? মাঝে মধ্যে মনে পড়ছে তার দুই একটা কথা, আমরা কলগার্ল, যা বলি তা-ই করি। আমরা কথা রাখি।

এটাই কি তোর কথা রাখার নমুনা?

ফাকিং, ফাকিং, হানড্রেড ফ্রা, ফাক মি?

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে আরেক কলগার্লের ডাকে।

*নো, মার্সি।* না, ধন্যবাদ। বলেই পা বাড়াই অন্যদিকে।

তখন ঘড়িতে রাত দুইটা।

মোবাইল কল। আমার সুদৃশ্য স্যামসং মোবাইলটায় চোখ বুলিয়ে দেখি আমার ভগ্নিপতির কল। বললেন তিনিও খুজছেন তাকে হন্যে হয়ে।

ফাকিং, ফাকিং, হানড্রেড ফ্রা, ফাক মি?

আরো একটি কলগার্লের ডাক।

নো, মার্সি। না, ধন্যবাদ। বলে আমি সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

ভাবলাম বিয়ের আগে রাতে এতো নিঃসঙ্গ বর বোধহয় আর কেউ হয়নি।

*জেনিভা, সুইটজারল্যান্ড থেকে*
invisiblezz2002@yahoo.com

# পরকীয়া

– এম.এস আলম

আমার বন্ধুদের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, আমি পরকীয়ায় মগ্ন। সুতরাং আমি ভ্রান্ত এবং নষ্ট চরিত্রের অধিকারী। ঘরে বৌ থাকা সত্ত্বেও কেন আমি পরকীয়ায় মগ্ন, যাযাদির পাঠকদের বিচারালয়ে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে জবানবন্দি পেশ করে বিচারের ভার পাঠকদের হাতেই তুলে দিলাম।

হ্যা, আমার একটি টুকটুকে সুন্দর বৌ আছে ঘরের অন্যান্য শোভা বর্ধনকারী শোপিসের মতো। আর বৌ, বৌ না হয়ে শোপিসের ভূমিকা নেয়ার কারণেই তো আমি পরকীয়ায় নিমগ্ন। বৌ আছে বলেই তো বৌয়ের বুকের

ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারও আমার আছে। আমারও একটা মন আছে। বৌয়ের কাছ থেকে ভালোবাসা না পেলে মন তো পরমুখো হবেই। এই সহজ কথাটাই আমার বন্ধুদের পারি না সহজে বোঝাতে।

কারো পক্ষেই সম্ভব কি বুকের মাঝে যে হৃদয়টা রয়েছে তাকে অস্বীকার করা? আর হৃদয়ের ধর্ম তো এই–ই, সে শুধু সুখ খুজে বেড়ায়। সুখের ছোয়া যেদিকে পায় সেদিকেই সে নিত্য দৌড়ায়। বৌকে এই সত্যটি বোঝাতে আমার যে ভাই জান *লবেজান*। বৌ যদি এটা বুঝতো তাহলে –

*এই জীবনে কখনো কি বৌয়ের গলা ছাড়তাম*
*পরের ঘরের কড়া ধরে আমি কি আর নাড়তাম?*

কান্নাকাটি যতোই করি, বৌ আমার দরদ বোঝে না। সে আছে তার নিজের সুখে বিভোর। আর কাজ যেন তার একটাই, রান্নাঘরে যাওয়া আর নিত্যনতুন আইটেম রান্না করা। আমি যতোই বলি আগুন তো পেটে নয়, আগুন জ্বলছে বুকে।

জবাব তার, রাতে এক শয্যাতে না–ইবা যদি ঘুমাই তবে সন্তান এলো কোথা থেকে।

বলুন তো ভাই, এটা কি কোনো জবাব হলো?

কি করে যে তাকে বোঝাই, অন্ধও তো হাটে। তফাতটা এখানে যে, চোখমান হাটে দেখে আর অন্ধ হাটে না দেখে। সন্তান উৎপাদন করে মিথুন এবং প্রেম উৎপাদক সে হৃদয় বা মন।

তবু তার বুঝ একটাই, রাতে এক বিছানায় ঘুমালেই প্রেমের ষোলকলা।

তাই তাকে তার সুখে ছেড়ে দিয়ে বৃথা চেষ্টা না করে এখন পরমুখেই সুখ খুজি। এটাই আমার আপাত সান্ত্বনা। এতে যদি হৃদয়ের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয় ক্ষতি কি? বদনামের কালিমা কিছু না হয় মাখলোই গায়ে। রসনায় তৃপ্তি যদি মেলে, এটো–বাসি কি আসে যায়? তৃপ্তি বলে কথা। পরকীয়ার অন্য সব মজার কথা আজ না হয় না–ই বললাম।

তাছাড়া আমি একাই কি ভ্রান্ত? আসলে আমি তো জানি *সুযোগের অভাবে অনেকেই সৎ।* সবশেষে বন্ধুদের উদ্দেশে আমার কথা –

*শোনরে বন্ধু শোন*
*পরের বৌ–র মন গলানো*
*সেও একটা গুণ।*

*কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে*

## ছোয়া

সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। মনে অফুরন্ত আনন্দ। তারপরও ভর্তি হয়েছি একটা ভালো সাবজেক্টে। সঙ্গত কারণে সাবজেক্টের নাম উল্লেখ করলাম না। তিনি আমাদের সাবজেক্টেই পড়েন। এক বছর সিনিয়র। নাম বন্যা।

আপাটি ছিলেন অপরূপ রূপের অধিকারিণী। সম্ভবত আপাকে সৃষ্টিকর্তা শুক্রবার তৈরি করেছিলেন। শুক্রবার বলছি এ জন্য যে, শুক্রবার তো ছুটির দিন। এদিনে সবার ব্যস্ততা কম থাকে। তাই এই দিনে সৃষ্টিকর্তার ব্যস্ততাও হয়তো কম থাকে। সে জন্য আপুকে তৈরি করতে তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। দীর্ঘ সময়ের ফল তো ভালো হবেই।

আপাটি বেশ চটপটে। আপাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেল। শুধু আমারই না, ইউনিভার্সিটির অনেক বড় ভাই, এমনকি অবিবাহিত শিক্ষকদেরও তিনি ভালোলাগার পাত্রী। জানতে পারলাম, আপা নাকি কাউকে

পাত্তা দিচ্ছেন না। আমার এবার হাল ছেড়ে দেয়ার পালা। কারণ, যেখানে শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়েরা চান্স পাচ্ছেন না সেখানে আমার মতো এক ছোট ভাই চান্স পাবে কি ভাবে?

একদিন দরজার সোজা বসে ক্লাস করছি। এমন সময় সেই দরজার সামনে দিয়ে আপা যাচ্ছেন। হঠাৎ ক্লাসের দিকে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমিও ওই মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলাম। অর্থাৎ আপার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জিভ ভেংচি দিলাম। উল্লেখ্য আমাদের ক্লাসে যদি বাদরামিতে নোবেল প্রাইজ দেয়া হতো তাহলে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে আমিই সেটা পেতাম।

যাহোক, আপা আমার সেই জিভ ভেংচি দেখে টাটা গাড়ির মতো ব্রেক কষলেন এবং কটমট চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আপার ব্রেক কষা এবং তাকানো দেখে আমার আত্মারাম খাচা ছেড়ে পালানোর জোগাড়।

সেদিনের ক্লাসের পড়া আর আমার কানে ঢুকলো না। ক্লাস থেকে স্যার বের হতেই ওই আপা এসে হাজির সোজা আমার টেবিলে।

বললাম, আ–আ–আপনি।

হ্যা, আমি। তোমার এখন ক্লাস আছে?

না।

তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। এদিকে এসো।

কি কথা?

কেন, যে কথা তুমি বলতে চাও।

আমি তো আপনাকে কোনো কথা বলতে চাই না।

কিন্তু আমি যে বলতে চাই।

এখানেই বলুন।

না, এদিকে এসো।

আমি বাধ্য ছেলের মতো তার পিছু নিলাম। আপা সোজা ক্যান্টিনে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, কি খাবে?

কিছু না।

তোমাকে বিল দিতে হবে না।

বিলের জন্য নয়। আসলে আমার খাবার ইচ্ছে নেই।

কলা ও কেকের অর্ডার দিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালেন।

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

আমাকে বললেন, তোমার নাম কি?

নয়ন।

বিস্তারিত জানার পর বললেন, থাকো কোথায়?

বললাম মেসে।

হঠাৎ আপা আমাকে চমকে দিয়ে বললে, তুমি যে আমার সঙ্গে বেয়াদবি করেছো এটা জানো?

বললাম, হ্যা।

আপা বললো, কেন করেছো?

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, আপনাকে ভালো লাগে, তাই।

আমি যে এভাবে তার কথার উত্তর দেবো সেটা তিনি আশা করেননি। তাই আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এবং বললেন, পরবর্তীকালে যেন এমনটি না হয়।

আর কখনোই এমনটি হবে না বলে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর আপার সঙ্গে আর কখনো কথা বলিনি। যদিও একই সাবজেক্টে পড়ার কারণে প্রতিদিন কমপক্ষে দশবার বা তার অধিক দেখা হতো।

কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে গিয়ে আমার চোখ তো ছানাবড়া। দেখি বেশির ভাগ ছেলেরা পাঞ্জাবি–পাজামা এবং মেয়েরা শাড়ি পরা। হঠাৎ মনে পড়লো আজ তো ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে দেখি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কম। আমারও ক্লাস করার ইচ্ছা উবে গেল। ফ্যাকাল্টি থেকে বেরিয়ে ডায়ানা চত্বরে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তি সহকারে টানছি। এমন সময় ওই আপা অর্থাৎ বন্যাআপা এসে হাজির। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দিলাম।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বললো, নয়ন, আমি তোমার মেসে যেতে চাই, আমাকে নেবে?

আপনি সত্যিই যাবেন?

হ্যা।

আপাকে নিয়ে ঝিনাইদহে এলাম। রুমে আসার সময় কিছু ড্রাই ফুড ও কোক নিলাম। যদিও আপা বাধা দিয়েছিলেন।

নাশতা শেষে আপা তার ব্যাগ থেকে একটা পাঞ্জাবি–পায়জামা এবং এক গুচ্ছ গোলাপ বের করলেন। পাঞ্জাবি–পায়জামা আমার হাতে দিয়ে বললেন, পরো।

বললাম, এগুলো কেন এনেছেন?

আপা বললেন, কেন এনেছি সেটা পরে, আগে পর তো।

আমি পরলাম।

তারপর আপা বললেন, তুমি এতোদিন আমার সঙ্গে কথা বলোনি কেন?

বললাম, ভয়ে।

আপা গোলাপগুলো আমার হাতে দিয়ে আলতো করে আমার ঠোটে ঠোট ছোয়ালেন। তারপর বললেন, আজ থেকে তোমার সমস্ত ভয় দূর করে দিলাম।

আপা আমায় ছেড়ে চলে গেছেন এক বছর হলো। কিন্তু আপার সেই ঠোটের ছোয়া আজও কল্পনায় অনুভব করি।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুষ্টিয়া থেকে*

## মহুয়ার খোজে

– মোহাম্মদ আবিদ করিম মুন্না

ছোটবেলা থেকেই গাছ–গাছালির প্রতি তীব্র একটা নেশা আমাকে আবিষ্ট করে রাখতো। বাবা–মায়ের মতো নিজেরও এক সময় ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার।

কিন্তু ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কৃষিবিদ হওয়ার মানসে শেষ পর্যন্ত স্থান করে নিতে হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ–কে।

গ্র্যাজুয়েশন শেষে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পালা। মাঝখানে ছয় মাসখানেক বিরতি। ফিরে এলাম চিরচেনা রংপুর শহরে। চিন্তা করলাম সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে সুনিপুণভাবে।

কমপিউটার কোর্সে ভর্তি হলাম আর পাশাপাশি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করলাম গাছগাছালি নিয়ে। শুরু করলাম ঋতুরাজ বসন্তের ফোটা ফুল পলাশ–শিমুল–পারিজাত দিয়ে। এবং শেষ করলাম বর্ষার দূত কদম দিয়ে। এভাবে লেখালেখি করতে করতে কখন যে গেল কেটে ছয় মাস বুঝেই উঠতে পারলাম না।

আমার লেখালেখির মূল উদ্দেশ্য ছিল, বৃহত্তর রংপুর তথা পাঠককুলকে শহরের বুকে যে সমস্ত গাছপালা রয়েছে, ফুল ফুটলে সেই সব গাছ পালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া।

এরই ধারাবাহিকতায় এক সময় চিন্তা করলাম, লিখতে হবে বসন্তের বাতাসকে পাগল করা তীব্র গন্ধের ফুল *মহুয়া* নিয়ে। কিন্তু গাছটিকে খুজে পাই কোথায়?

অনেক অভিজ্ঞজনকে জিজ্ঞাসা করেও যখন খুজে পাচ্ছিলাম না গাছটি ঠিক সে মুহূর্তেই আমার ছাত্র ফারুক জানালো, শহরের দক্ষিণ কামাল কাছনা এলাকার এক বাড়িতে বিচিত্র একটা গাছ আছে। ফুল আসা শুরু করলেই সে বাড়ির লোকজন জাল দিয়ে নাকি পুরো গাছটিকে ঢেকে দেয়। ভাবলাম, লিচু গাছ জাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু এটা আবার কোন গাছ!

কালবিলম্ব না করে আমার সেই ছাত্রকে নিয়ে ছুটলাম সে বাসায় দিকে। গেটের কাছে গিয়ে রিকশা থামিয়ে ভাড়া মেটালাম। ঠক ঠক শব্দ করছি। কিন্তু কেউ গেট খুলছে না। এদিকে আঙুলের অবস্থা বারোটা বাজার উপক্রম। এক সময় পকেট থেকে চাবির গোছাটি বের করে চাবি দিয়ে জোরে জোরে শব্দ করতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পেলাম।

গেটের ফাক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, কুকুর গেটের দিকেই তেড়ে আসছে। না জানি, কোন মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছি। কুকুরের পাল্লায় পড়ে আবার গায়ের মাংস সব আলাদা না হয়ে যায়! গেটটি খুলে দিল অষ্টাদশী, অপরূপা এক সুন্দরী।

আমাদের পরিচয় জানালাম। জানতে চাইলাম আপনাদের বাসায় একটা গাছ আছে যে গাছটি...।

কথাটা শেষ না করতেই পশ্চিম দিকে আঙুল উচু করে দেখিয়ে দিল আর জানালো গাছটির নাম মহুয়া।

আমার অনেক সন্ধানের মহুয়া গাছকে শহরের মাটিতে প্রথম দেখতে পেয়ে অপরিসীম আনন্দে মন ভরে উঠলো।

পশ্চিম অকাশে সূর্য তখন হেলে পড়ছিল। মেয়েটির চোখে মুখে সেদিনের শেষ সূর্যের আভা এসে স্পর্শ করলো। ঠোট বাকানো চমৎকার হাসিতে ভীষণ ভালো লাগছিল তাকে। বৃক্ষ প্রেম থেকে মুহূর্তের মধ্যেই আমার মনে মনুষ্য প্রেম দোলা খেতে লাগলো।

দিন দশেক পর ক্যামেরাসহ এক বন্ধুকে নিয়ে আবার চলে গেলাম সেই বাড়িতে। আবারও গেটে নক।

ভেতর থেকে মেয়েলি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, বাসায় কেউ নেই। গেট খোলা যাবে না।

তখন ভরদুপুর। ক্যামেরা যেহেতু এনেছি, আজ ছবি তুলবোই।

নক অব্যাহত থাকার পর গেট খুলে দিল তিলোত্তমা নামের একটি মেয়ে। হাত দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ভাত খাওয়া রেখে উঠে এসেছে। চোখে মুখে বিরক্তির একটা ছাপও বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে মেয়েটি স্থান করে নিয়েছে এবং যাকে মনে মনে খুজছিলাম, সে কোথায়?

মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারি, তার মামাতো বোন পদ্য। ঢাকায় চলে গেছে।

কথাটি শোনা মাত্রই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম ক্ষণিকের তরে। মহুয়া গাছের ছবি তোলা শেষ করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু বার বার মেয়েটির সেই ঠোট বাকানো হাসি হৃদয়ের আয়নাতে ভেসে আসতে থাকলো, এক পলক দেখেই যাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

সময় চলে তার আপন তালে। চাকরি নামের সোনার হরিণের পেছনে অবিরাম ছুটে চলছি। রিকশা ছুটছে, উদ্দেশ্য নটর ডেম কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র। হঠাৎ মতিঝিল শাপলা চত্বর এলাকায় ট্রাফিক জ্যামে আটকে

পড়লাম। ডান দিকে তাকাতেই দেখি পাশের রিকশার ডান দিকে বসা একটি মেয়ে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরীক্ষার টেনশনও কাজ করছে। কে এই মেয়ে? মনে হচ্ছিল যেন অনেক দিনের চেনা। কিন্তু কোথায় দেখেছি তাকে? কথাটা যখনই ভাবছিলাম ঠিক তখনি জ্যাম ছুটে গেল। মনে পড়লো, এই তো সেই মেয়ে!

মহুয়া গাছটি খুজে পেয়েছিলাম যে বাড়িতে আর গাছটি আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল...। যাকে প্রথম দেখেই আমার মনে ভালোবাসার পাহাড় গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু এতো কাছে পেয়েও যে বলা হলো না ভালোবাসি... তোমাকে।

*সেন্ট্রাল রোড, রংপুর থেকে*

# ছোটমামা

– রুমা মৃধা

আমার এই মন নামের স্থানে পুরো স্থানই করে নিয়েছে আমার মামা, অতি আদরের ছোটমামা। অনেক দিন ভালোবাসা হয়নি। অনেক দিন আদর করা হয়নি। শুভেচ্ছা জানানোও হয়নি অনেক দিন। তাই তো ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং ভালোবাসা মামাকে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর সবটা হয়ে ওঠে না।

ব্যস্ততার ভিড়ে আমার মামা আমাকে আজ ভুলে গেছেন। মামার জীবনের পুরো পাতা জুড়ে হয়ে আছি হয়তোবা অতীত। এ কি করে সম্ভব? আমার মামা আমাকে ভুলে গেছেন! আমি বিশ্বাস করি না এবং কোনোদিন বিশ্বাস করবোও না। কারণ আমি জানি পৃথিবীর সবার আদর, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হলেও আমার মামার আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবো না কখনো। কেননা মামা তার নিজের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু আজ খুব জানতে ইচ্ছা করছে, এ মামাই কি আমার সেই মামা যে মামা আমাকে অন্ধের মতো ভালোবাসতেন।

ইদানীং কেন জানি মামার সঙ্গে আড্ডা দেয়ার কথা আমার সহসাই মনে পড়ে যাচ্ছে। মামার সঙ্গে চুকিয়ে আড্ডা দেয়ার মজাটা ছিল একেবারেই আলাদা। আড্ডা দেয়াকালে মামাকে আমি কতো না প্রশ্ন–উত্তরের সম্মুখীন করতাম তার কোনো শেষ নেই। বলতাম আচ্ছা মামা, আজ আমাকে যেমন ভালোবাসছেন, এমনিভাবে চিরদিন আমাকে ভালোবাসবেন তো, মনে রাখবেন তো? নাকি ভুলে যাবেন মিথ্যা ভুল বুঝে?

তখন মামা আমার প্রশ্ন–উত্তরে বলতেন, মামণি তুমি তো ভালো করেই জানো, ডাক্তারি জীবনটা কতো কষ্টের, কতো বড় ঝামেলার। ডাক্তারদের সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় রোগী এবং হাসপাতালের ডিউটি নিয়ে। তারপরেও রক্তের বন্ধন তো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় কখনো। সেক্ষেত্রে তোমাকে ভুলে থাকা কিংবা ভোলা প্রশ্নই আসে না।

মামা আমাকে কথা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখেননি। সত্যিই ডাক্তারি জীবন অনেক কষ্টের যা বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে মামা ডাক্তার না হয়ে অন্য কিছু হলেই ভালো হতো। তখন পরিবর্তন হলেও এতো বেশি পরিবর্তন হতে পারতেন না। অনেক ব্যস্ততার ভিড়েও যায়যায়দিন মামার অত্যন্ত প্রিয় একটা ম্যাগাজিন। তাই ভালোবাসা দিবসের ভালোবাসা জানানোর জন্য আশ্রয় নিলাম মামার প্রিয় যায়যায়দিনকে।

জানি না, অনেকগুলো লেখার ভিড়ে আমার এই তুচ্ছ লেখাটুকু মামার চোখে পড়বে কি না। যদি পড়ে তাহলে মামাকে জানাচ্ছি ভালোবাসা দিবসের অনেক অনেক আদর এবং ভালোবাসা। ভালোবাসা শুধুই ভালোবাসা।

*বোনারপাড়া, গাইবান্ধা*

# আকাশের ঠিকানায়

– তাহমিনা খলিল

ভালোবাসা দিবস সংখ্যায় সবাই হয়তো লিখবে একান্ত প্রিয়জন বা প্রিয়তমাকে নিয়ে। থাকবে প্রেম, ভালোবাসা, আনন্দ–উচ্ছ্বাস। কিন্তু আমার কেন যে আমার বাবাকে নিয়ে লিখতে ইচ্ছা করছে বুঝতে পারলাম না। হয়তো বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছি।

আমার বাবা মোমতাজউদ্দিন আহমেদ। আশুগঞ্জের সোহাগপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে অত্যন্ত জেদি আর মেজাজি স্বভাব নিয়ে বড় হয়েছিলেন। ছাত্র জীবনে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কিন্তু খামখেয়ালি।

আব্বার সাত মেয়ের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল চতুর্থ। ছোটবেলা থেকেই আব্বার সবচেয়ে কাছের ছিলাম আমি। আব্বার সঙ্গে খাওয়া, বসা ইত্যাদিতে আমার জন্য অন্য বোনেরা পাত্তাই পেতো না। আব্বাও মনে হয় আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

আব্বার চরিত্রের স্মার্টনেস, সততা, স্পষ্টবাদিতা, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা আমাকে আকর্ষণ করতো। অহংকার, গর্বে মন ভরে যেতো যখন শুনতাম বৃটিশ পিরিয়ডে আমার এই বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিসটিংশন নাম্বার পেয়ে পাস করে কাস্টমস বিভাগে চাকরি নিয়েছিলেন এবং অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে এক কথায় চাকরি ছেড়েছিলেন।

আর কোনোদিন চাকরি করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করে কলকাতা থেকে নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের মাটিতে বসবাস করতে লাগলেন।

এলাকার প্রথম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সরকারি চাকরি ছেড়ে দেয়ায় নিজের পরিবার এবং উচ্চ শিক্ষিত ছয় ভাইয়ের একমাত্র বোনকে বিয়ে করায় শ্বশুরবাড়ি থেকেও অসহযোগিতা পেলেন। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আশুগঞ্জ বাজারে ব্যবসা শুরু করলেন। সিংহ রাশির জাতক, অত্যন্ত পরিশ্রমী আব্বা ব্যবসায়ী জীবনে যেমন উন্নতি করলেন তেমনি এলাকার উন্নতির জন্য সারা জীবন কাজ করলেন। বাবার বিপরীত অত্যন্ত নরম স্বভাবের আমার মা কাদামাটির মতো তার জীবনে অপূর্ব ভালোবাসা আর মমতায় ঘিরে রইলেন।

আব্বা সারাটা জীবন তার নিজ এলাকা ছেড়ে আর কোথাও গেলেন না। আমরা বাইরে থেকে পড়াশোনা করতাম, এলাকায় গেলে আব্বার মেয়ে হিসেবে সবার প্রশংসার দৃষ্টি কুড়াতাম। অহংকার হতো যখন দেখতাম আব্বাকে এলাকার একজন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে শিক্ষিত প্রতিটা লোক শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে ও ভালোবাসে।

আব্বা কথা–বার্তা, চলা–ফেরায় এতো স্মার্ট ছিলেন, আশুগঞ্জ এলাকায় তার নাম মোমতাজউদ্দিন সাহেব হারিয়ে গিয়ে শুধু *সাহেব* বা স্থানীয় ভাষায় *সাব* নামেই পরিচিত ছিলেন।

অন্যায়ের প্রতিবাদকারী আর অন্যের উপকার করার এতো মহৎ গুণ আর কারো চরিত্রে দেখিনি। কেউ বিপদে পড়েছে, কে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে না, কোন বন্ধু অর্থের অভাবে কষ্ট করছে, গায়ে পড়ে তাদের উপকার করতে যেতেন। প্রায়ই বলতেন, জীবনটা যদি অন্যের উপকারেই না লাগলো তাহলে এ জীবনের কোনো মানে হয় না। আমাদের প্রায়ই পাশে বসিয়ে জীবনের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

দলীয় রাজনীতি না করেও অন্যায়ের প্রতিবাদে তার নীতিতে আপোস না করে চারবার কারাবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে বন্দী হন। আশুগঞ্জ ওয়াপদা হওয়ার ব্যাপারে আব্বার অবদান ছিল অনেক। তৎকালীন কর্মরত বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আব্বার ছিল ঘনিষ্ঠতা। আব্বা বন্দী হওয়ার পর এলাকার সমস্ত লোক আশুগঞ্জ ওয়াপদায় কর্মরত বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে

প্রায় বিশ একুশ দিন পর ছাড়িয়ে আনেন। কিন্তু ততোদিনে তিনবার ইনসুলিন ব্যবহারকারী ডায়াবেটিক রোগী আমার বাবার শরীরে পথ্য ও ওষুধের অভাবে ভাঙ্গন ধরে যায়।

আব্বার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের জন্য কেউ আব্বার সামনে কোনো কথা বা তর্ক করার সাহস পেতো না। আমি অনেক সময় আব্বার জেদ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতাম। তাই আব্বা আমাকে সব সময় ব্যারিস্টার বলে ডাকতেন। এই ডাকে যে কতো আদর, ভালোবাসা লুকিয়েছিল এখন বুঝতে পারি। আব্বা প্রচুর পড়াশোনা করতেন। বাবার বইয়ের আলমারির সারি সারি বই ছোটবেলা থেকেই আকর্ষণ করতো। পাকিস্তানি আর্মিদের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই আব্বার চোখের জ্যোতি ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। দুইবার চোখ অপারেশন করার পরও তেমন ভালো হলো না। পড়াশোনা করতে কষ্ট হতো। তার পড়তে না পারার কষ্ট আমাকে ছুয়ে যেতো।

১৯৭৮ সালে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ১৯৭৯-তে স্বামী উচ্চ শিক্ষার জন্য জাপান চলে গেল। আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। প্রায়ই ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ি চলে আসি আব্বার কাছে। আব্বা তখন প্রায় চোখে দেখতেই পান না, আমি পত্রিকা পড়ে শোনাই। বই পড়ে শোনাই। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি, তর্ক করি। দেখতে পাই চোখে দেখতে না পারার কারণে এলাকায় দাপটের সঙ্গে যিনি সারা জীবন চলাফেরা করেছেন, কিভাবে ধীরে ধীরে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। অসুস্থ অবস্থায়ও মানুষের কথা, এলাকার উন্নয়নের চিন্তা করতেন। আমাকে দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রী, ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি নিয়ে চিঠি লেখাতেন। এসব নিয়েও আমাদের তর্ক বাধতো। আমি চাইতাম, আব্বা অসুস্থ অবস্থায় এসব চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিক।

১৯৮১ সালের এপৃল মাসে স্বামীর কাছে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু মনে মনে শংকা, বিদেশ থেকে এসে আব্বাকে দেখতে পারবো তো। দেখতে দেখতে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। মাকে জড়িয়ে ধরে কাদছি। প্রচণ্ড রাশভারী পিতা আমাকে ধমক দিলেন। স্বামীর কাছে যাচ্ছি আবার কান্নাকাটি কিসের!

আব্বাকে সালাম করতে গিয়েই আব্বার বুকে ঝাপিয়ে পড়লাম।

আমার ব্যক্তিত্বশালী পিতা জীবনের প্রথম তার আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেদে উঠলেন। বাবা-মেয়ের কান্নায় প্রত্যেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।

বিদেশে যাওয়ার পরও সারাক্ষণ আব্বার জন্য মন খারাপ হয়ে থাকতো। আব্বা বড় বড় চিঠি লিখতেন। আমি খুব সাহসী, বিদেশে আমি যেন সাবধানে থাকি, আমার জন্য তার খুব চিন্তা হয়।

আব্বার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। বেয়াদবি করেছি। সে সব কথা মনে করে অনেক সময় মন খারাপ করে একা একাই কাদতাম। প্রায়ই ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করতো। আব্বা আবার ছেলেমানুষি ভাবেন সেটা ভেবে লজ্জা লাগতো। তারপরও একদিন চিঠি লিখলাম – *বিদেশে আমার একটুও ভালোলাগে না। আপনার কথা খুব মনে পড়ে। এতো জেদ করেছি, বেয়াদবি করেছি, এখন খুব খারাপ লাগে, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।*

১৯৮১ সালের ২৯ জুলাই। রোজার ২৭ তারিখ শবে-কদরের নামাজের আয়োজন করছে সবাই। আব্বার শরীরটা নাকি সকাল থেকেই নরম। চুপচাপ শুয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর বাজার থেকে আমার চিঠি এসে পৌছালো মায়ের হাতে। মা হারিকেন নিয়ে বাবার পাশে বসলেন চিঠি পড়তে।

বিদেশে থেকে আপনার মেয়ের চিঠি এসেছে শুনেই তাকিয়ে বললেন, পড়ো। বলেই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

আম্মা চিঠি পড়েই দেখেন আব্বার চোখের কোণে পানি। আম্মা জিজ্ঞাসা করলেন, তাহমিনা আপনার কাছে মাফ চেয়েছে, আপনি তাকে মাফ করেছেন?

আব্বা অস্ফুট স্বরে বললেন, আচ্ছা।

এ ছিল তার শেষ কথা। কিছুক্ষণ পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আব্বার মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানানো হয়েছিল তিন মাস পর। এই তিন মাস আব্বার খবরের জন্য অস্থির থাকতাম, দুঃস্বপ্ন দেখতাম। মৃত্যু সংবাদ জানাতে হবে বলে কেউ একটা চিঠিও লেখেনি। আব্বার মৃত্যুর দুই মাস পর আম্মা একটা চিঠি লিখলেন, সবার খবরাখবর লিখলেন। চিঠির এক কোণায় লিখলেন, তোমার আব্বা ভালো আছে চিন্তা করো না।

চিঠি পড়েই কেন যেন মনে হলো আমি পিতৃহারা হয়েছি। এর এক মাস পর বোনের চিঠিতে জানলাম তিন মাস আগেই আব্বার মৃত্যু হয়েছে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দুঃসংবাদ যতো কষ্টেরই হোক, দূরে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনদের যতো শিগগির সম্ভব জানানো উচিত। তিন মাস বাবার কোনো সংবাদ না পেয়ে যে কষ্ট পেয়েছি তা মৃত্যু সংবাদ পাওয়া থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

এখন পর্যন্ত আমার একটাই অহংকার এবং গর্ব, আমার বাবার সন্তান হিসেবে জন্ম নিতে পারা। এই পৃথিবীর কোনো ভালোবাসাই আব্বার প্রতি আমার ভালোবাসা ছোট করতে পারবে না। তাই ভালোবাসা দিবসে আব্বার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আকাশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

# স্বামী

– নবনীতা

অফিস থেকে ফিরতে বেলা তিনটা বেজে গেল। কোনো মতে একটু কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়লাম। হাতে একদম সময় নেই। সাড়ে চারটায় তাকে দাড়াতে বলেছি। এতোগুলো বছর পর যুগ যুগান্তরের না বলা কথাগুলো তাকে বলার সুযোগ পাবো। অজানা এক আনন্দে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে শিহরণ জাগে আমার।

গোসল সেরে আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবি, কোথায় সেই দশ বছর আগের ছটফটে কিশোরী মেয়েটি আর কোথায় জীবনের কঠিনতম, নিকৃষ্টতম অধ্যায় পার করে আসা বাইশ বছর বয়সী সাধারণ চাকরিজীবী এক তরুণী! আকাশ–পাতাল না হলেও খানিকটা তফাত তো থাকবেই। আরো সাত–পাচ নানান কথা ভাবতে ভাবতে তৈরি হতে থাকি। আমার হারিয়ে ফেলা সোনালি কৈশোরের স্মৃতিগুলো সব গোধূলি লগ্নে এক ঝাক নীড়ে ফেরা পাখির মতো মাথার ভেতরে কিচিরমিচির আওয়াজ তুলতে শুরু করে।

মফস্বল শহরের নামি স্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়া ছোট্ট মেয়েটাকে তারই এক দুষ্টু–মিষ্টি চেহারার সহপাঠী মনের অজান্তে মন দিতে শুরু করে। তার ভাষায়, ভালোবাসা শব্দের অর্থ বোঝার আগেই সে আমায় বুঝতে শুরু করে। সেই থেকে এসএসসি পর্যন্ত কখনো ক্লাসে, কখনো ছবি আকার ফাকে, কখনো বা বাড়িতে চলে দুটি অবুঝ কিশোর মনের চোখাচোখি, খুনসুটি, বাকা হাসির লেন–দেন অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সরল বন্ধু সুলভ আড্ডা। ঝগড়াও যে হতো না তা নয়।

একবার মনে আছে, ক্লাসের আরেকটি ছেলের কাছ থেকে পরীক্ষার রুটিন নিয়েছিলাম। তার জন্য অভিমানেও নিজের পকেটে রাখা আমার জন্য আনা রুটিনের কাগজটাকে ছিড়ে কুটি কুটি করে কেদেছিল। আমার ব্যাপারে সে বরাবরই এমন স্পর্শকাতর ছিল। তার আর আমার রোল নাম্বার ছিল পাশাপাশি। আমি কেমন ভঙ্গিতে রোল কলে প্রেজেন্ট বলি তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে প্রায়ই সে নিজে প্রেজেন্ট বলতে ভুলে যেতো।

সে সময় বিটিভিতে *কোথাও কেউ নেই* নাটকের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বিশেষ কারণবশত স্কুলের বন্ধুরা আমাদের দুজনকে বাকের ও মুনা বলে ডাকতে শুরু করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুনা একদিন বাকেরের কাছে ফিরবে। মনের অজান্তে আমারও কেমন যেন ভিন্ন অনুভূতি জন্মাতে থাকে হৃদয় গহীনে। তারপরও কোনো এক দুঃস্বপ্নের মতো দিনে নির্বোধ আমি আমার কিশোর বয়সের পাগল প্রেমিকটিকে নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করি। এক মাদকাসক্ত, অসৎ, দুশ্চরিত্র, বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে বিপথে যেতে শুরু করি। মনে করতে চাই না অসহ্য, দুর্বিষহ সেই দিনগুলোর কথা।

এসএসসি–র পর বাবার চাকরি সূত্রে আবার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। তারপর সাতটি বছর আমার জীবনে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। এরই মধ্যে এইচএসসি পাস করে চাকরিতে ঢুকি। মাঝের সাতটি বছর আমার কাছে দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ংকর। আমার ভুলেই আমাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সাত বছর পর আবার একা পথ চলতে শুরু করেছি। একাকী বন্ধুহীন জীবনটাকে নিয়ে বড় অসহায় বোধ করতে থাকি। জীবনের এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে আমার হারিয়ে ফেলা পাগল প্রেমিক, প্রিয় সখার সঙ্গে দেখা। আমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিমানী ছেলেটি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ভীষণ ভালো আকতো সে। শিল্পী ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজের ছবি আকার ক্যারিয়ারকে যোগ্যতর লক্ষ্যে পৌছে দিতে। কখনো জানতে পর্যন্ত দেয়নি তার গোপন ভালোবাসা, নিভৃত অশ্রুজল।

সেদিন তাকে দেখে আমার নিস্তরঙ্গ বুকে উথাল–পাথাল ঢেউ ওঠে। মনে হয় জীবনে প্রথম কারো প্রেমে পড়তে যাচ্ছি। সেই অকৃত্রিম টোল পড়া হাসি, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটি আমায় মোহাবিষ্ট করে রাখে। তার বন্ধু সুলভ সহানুভূতিতে সহজ আচরণে আপ্লুত হই, গভীরভাবে অনুতপ্ত হই, চিরতরে ঋণী হই, হাসিমুখে পরাজিত হই তার আশ্চর্য ভালোবাসার কাছে। ভীষণভাবে আনন্দিত হই তাকে জয়ী হতে দেখে। দেরিতে হলেও তার তো জয় হলো! বেটার লেট দ্যান নেভার। নিজের সর্বস্ব উজাড় করে আত্মসমর্পণ করি। পরদিনই ফোন করে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

আজ সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। নির্দিষ্ট সময়ে দুরু দুরু বুকে রিকশা থেকে নামি। কি অসম্ভব সুন্দর যে লাগছে তাকে! বাইসাইকেল কিনলো কবে? আজই তাহলে? আগে বললো না তো! আমার জন্য সারপ্রাইজ। ছেলেমানুষির বয়স একটুও বাড়েনি তাহলে! আনন্দে আত্মহারা হই আমি। বাইসাইকেলের পেছনে আমায় বসিয়ে আমার রূপকথার রাজকুমার যেন পক্ষিরাজ ছুটিয়ে তেপান্তরের স্বপ্নরাজ্য পাড়ি দেবে বলে। মুক্তির ডানায় ভর দিয়ে প্রথম আকাশে ওড়ার স্বাদ অনুভব করি যেন।

এরপরের দিনগুলো স্বপ্নের মতো হু হু করে কেটে যায়। বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়ে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুটি তার উদার, প্রেমময় স্পর্শে নতুন করে বাচিয়ে তোলে। তার ইচ্ছামতো লাল, নীল পালকে সজ্জিত আমি যেন স্বর্গের পবিত্র অপ্সরী। তার ছোয়ায় এই জন্মের সবটুকু পাপ, কলংক ধুয়ে মুছে যায় আমার।

একটি বছর যেন এক নিমেষে পার করি আমরা সুখের ভেলায় ভেসে। উপলব্ধি করি একজনকে ছাড়া অন্যজন কতোটা অসম্পূর্ণ আমরা। কল্পনার চেয়েও বেশি মিলে যেতে থাকে বাস্তবে সব কিছু।

এবারে আসে জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তটি। বিয়ের কাগজে সই করার সময় এতোটুকু হাত কাপে না আমার। কারণ, আমি জানতাম সঠিকতম সিদ্ধান্তটিই নিয়েছি। আমাদের আড়াই বছরের বিয়ের জীবনে কখনোই এ অনুভূতি, বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। আজও সে আমাকে কিশোর বেলার মতোই ভালোবাসে। এতো সুখও কি ছিল আমার কপালে!

আমার স্বামী, আমার সমগ্র জীবনের সাধনা, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় বন্ধু। তাকে আমি জনম জনম ধরে ভালোবেসে যেতে চাই। তবুও বুঝি সাধ মিটবে না আমার। সে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে কৈশোরের নিষ্পাপ

অনুভূতি, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, সাত জনমের না পাওয়া যতো স্নেহ–ভালোবাসা। নীল সমুদ্রে উত্তাল অবগাহন, নৌকায় শুয়ে আকাশ ভরা পূর্ণিমা দেখা, সবুজ ঘাসে বসে শান্ত হ্রদে শীতের পাখিদের কলকাকলিতে মুখর প্রকৃতি দেখা, বসন্তের কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম সৌন্দর্যে বিভোর হওয়া, কোকিলের গানে হৃদয়ে বসন্ত হাওয়া বয়ে যাওয়া, ঝুম বৃষ্টিতে বাইসাইকেল অথবা রিকশায় দুজনে মিলে কাকভেজা হয়ে শহরময় ঘুরে বেড়ানো আরো কতো শত অজস্র মধুর মুহূর্ত যে স্মৃতি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এছাড়াও নাটক, সিনেমা, প্রদর্শনী, রেস্টুরেন্ট, শপিং, সংসার কোনোটাতেই আগ্রহের কমতি নেই দুজনের।

আমার রান্না ছাড়া সে কোথাও গিয়ে খেতে পারে না। আমিও মহোৎসাহে তার নিত্যনতুন ফরমায়েশ পূরণ করতে চেষ্টা করি। বাড়িতে পা দিয়ে আত্মীয়, বন্ধু ও শুভার্থীরা একরাশ আশীর্বাদ, শুভ কামনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যায়। এতো ভালো যে লাগে তখন!

সবচেয়ে আনন্দের কথা হলো, আমাদের রূপকথার মতো সংসারে নতুন অতিথি আসছে খুব শিগগিরই। আমার ভেতরে এখন প্রতিনিয়ত নতুন প্রাণের স্পন্দন। প্রতি অনুক্ষণ আমরা নতুন স্বপ্নের জাল বুনে চলেছি। অধীর আগ্রহে দিন গুণছি অনাগত সন্তানের মুখটি দেখার জন্য। আমাদের তাবৎ চিন্তা–চেতনা এখন তাকে ঘিরে আবর্তিত।

এই জগতের, এই জীবনের সমস্তটুকু সুখ যে মানুষটি আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে সেই অসাধারণ মানুষটির জন্য এ ভালোবাসা দিবসে আমার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিলাম। এই ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা দিবসের জন্য নয় – প্রতিদিন, প্রতি অনুক্ষণের জন্য। আমি গর্বিত, এমন চমৎকার মানুষটি আমার সন্তানের বাবা, তাই। আমি ধন্য তোমাকে পেয়ে।

প্রার্থনা করি, যাযাদির সকল পাঠক তাদের জীবনের সঠিক ও যোগ্যসঙ্গীকে খুজে পাক এই ভালোবাসা দিবসে।

*মহাখালি, ঢাকা থেকে*

## শক্তি

পরীর বিলের ঝলমলে পরীর মতোই একদিন সে এসেছিল। তখন আমার হাফপ্যান্ট পরার বয়স। মায়া ভরা মুখে তাকাতো, ভাষাহীন চোখে কথা বলতো। মিষ্টি মিষ্টি সব কবিতা লিখতো। পাশাপাশি ঘরে সাতটি বছর কাটিয়েছি। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ টের পেতাম। সামনে পড়লে কখনো গলে মোম হয়েছে সে। লজ্জায় নির্বাক হয়েছি আমি। কিন্তু একটা কথাও হয়নি। আমার প্রথম প্রেম। খুকুমণি। ক্লাসে ছেলেরা ক্ষেপাতো। তাকেও। একই স্যারের কাছ প্রাইভেট পড়তাম। স্যার অনেক সময় ভুল (?) করে ফেলতেন। আমার বই তার কাছে, তার বই আমার কাছে চলে আসতো। বাসার কাজের ছেলেরা অবশ্য এসব ঠিকঠাক করে দিতো। কথা বলার আর দরকার হতো না।

শীতে উঠানে বসে রোদে চুল শুকাচ্ছে, হাতে একটা বই। অতি সন্তর্পণে আমি দোতলার জানালার পাশে। কিভাবে টের পেতো জানি না। মুখ ঘুরিয়েই চোখাচোখি। পালিয়ে বাচি। ভাদ্রের রোদে বই শুকাতে দিয়েছি ছাদে। কোন ফাকে সে এসে উল্টে–পাল্টে দেখছে বইগুলো, আমার হাতে লেখা নোটগুলো। আমি এসে পড়লেই সে হাওয়া।

এসএসসি পরীক্ষার আগেই তারা একটু দূরে নিজেদের বাড়িতে ওঠে। কলেজে গিয়ে আবার দেখা। *বিজ্ঞান মেলা*–র সময় একটু কাছে আসা। কিন্তু কথা হয় না। সেদিন বুকের কাছে যে চিনচিনে ব্যথাটা টের পেতাম তারও কি এ রকম লাগতো? জানি না।

সে আজ অনেক দূরে, পরের ঘরণী। আমিও সংসারী। ব্যথাটা যে সারাতে পারি না! এরই নাম কি প্রেম, ভালোবাসা?

দেখুন মানুষের মন! তার বড় বোন, নাম বলবো না। একদিন দুপুরে চড়ুই পাখি ধরে দেবে বলে আমাকে ছাদে নিয়ে গেল। এদিক–সেদিক তাকিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব চুমু খেল। ব্লাউজের ফাক গলিয়ে ফর্শা স্তন বের করলো। চুষতে বললো। খুব মজা পেলাম। হাফপ্যান্ট নামিয়ে আমারটা হাতে নিয়ে খেলতে লাগলো। আমি লজ্জায় লাল। এরপর মুখে পুরে চুষতে লাগলো। কাউকে না বলার জন্য দুটো চকলেট ঘুস পেলাম।

বড় দুলাভাই বেকার হওয়ায় ঘরজামাই হিসেবে আমাদের ঘরেই থাকতেন। একদিন আপারা সবাই নানাবাড়িতে বেড়াতে গেলেন। ঘরে শুধু আমি, দুলাভাই আর কাজের মেয়ে। রাতে আমার একা থাকতে ভয় লাগবে বলে আমাকে তার বিছানায় নিয়ে গেলেন। ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙলো মাঝ রাতে। পরনে আমার লুঙ্গি নেই। উপুড় হয়ে আছি। দুলাভাই তার কালো মোটা জিনিসটি আমার পায়ু পথে ঢোকানোর কসরত করছেন। লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কথা বলতে পারলাম না। দুলাভাই অপকর্ম সেরে শান্ত হলেন।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর নির্ঘুম চোখে বাকি রাতটা ঘুমালাম। পরদিন আগেভাগেই নিজের রুমে দরজা আটকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো কাজের মেয়ের গলার আওয়াজে। ভয়ে দরজা খুলিনি।

সকালে কাজ করতে করতে কাজের মেয়ে বললো, তোমাদের দুলাভাইটা লোক ভালো না।

আমি চুপ থাকলাম। আপারা ফিরে আসার পরও লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আমার কৌতূহল বেড়ে গেল।

একদিন দুপুরবেলা। বাসার অন্যরা কাছেই একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছে। আমি আপার কাছে অংক কষছি। বলা নেই কওয়া নেই, দুলাভাই কোত্থেকে হুড়মুড় করে এসে দরজা আটকিয়ে দিয়ে আপাকে একটানে তুললো বিছানায়। আপা করো কি, করো কি, সে কি ভাববে (আমাকে দেখিয়ে), পাগল হলে নাকি! বলে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু ততোক্ষণে তার গায়ে একটা কাপড়ও আর নেই।

আমি না পারছি দরজা খুলতে, না পারছি পালাতে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অংক কষতে লাগলাম মন দিয়ে।

একটু পরেই দুলাভাইয়ের ফরমায়েশ, ফ্যানটা চালিয়ে দাও তো মিয়াভাই।

ফ্যানের সুইচ অন করে ফিরে আসছি। চোখ পড়লো আদিম লীলারত মানুষ দুটোর ওপর। আশ্চর্য! আপাও দেখি আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। বললেন, আজ আর অংক হবে না। খাতা–বই গুটিয়ে রাখো। আমি অন্য অংক মেলাচ্ছি। আমার ঘেন্না করতে লাগলো।

বিকৃতির ভূত আস্তে আস্তে ভর করতে লাগলো। ঠিক এমনি সময়ে একজন বিকৃত মানুষের লেখা আমার হাতে পড়লো, *খেলারাম খেলে যা*। পড়ে ফেললাম। একবার দুবার, তিনবার। প্রথমে কৌতূহল। পরে জাগলো বিশ্বাস। অসংখ্য, অজস্র জাহেদা, বাবলি, শরিফায় ভরে আছে আমাদের চারপাশে। তেমনি বাবর আলীরও অভাব নেই।

মানুষের ভেতরের মানুষ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। আমি দেখেছি কি বিচিত্র মানুষের চরিত্র! কবির ভাষায়, *একই অঙ্গে নানান রূপ।* দেখেছি যৌবনের কাছে মানুষের অসহায়ত্ব। দেখেছি যৌনতার পরাক্রম। ভালোবাসার শক্তির কাছে সব কিছুই ম্রিয়মাণ।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## টিপস

যেসব ছেলে বা মেয়ে নতুন প্রেম করার চিন্তা–ভাবনা করছেন তাদের জন্য কিছু টিপস।

একটি ছেলে বা মেয়েকে দেখে ভালো লেগে গেলেই প্রেম নিবেদন করবেন না। আগে দেখুন ছেলে বা মেয়েটি আপনার যোগ্য কি না। অর্থাৎ ওই ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে আপনার পরিবার এই প্রেম মেনে নেবে কি না। ছেলেটির আয় কেমন। মনে রাখবেন শুধু প্রেম–ভালোবাসা দিয়ে পেট ভরে না।

আপনি যে রকম যোগ্য ঠিক সেই রকম যোগ্য ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবেন।

অযথা কম বা বেশি যোগ্য ছেলে কিংবা মেয়ের পেছনে ঘুর ঘুর করবেন না। এই ধরনের প্রেম কোনো অভিভাবক মেনে নিতে চান না।

আপনার যে ধরনের পরিবার ঠিক সেই ধরনের পরিবারের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে কোনো অসুবিধা হবে না।

মনে রাখবেন, ছেলেদের যোগ্য মনে করা হয় তার ভালো আয়–রোজগার এবং সৎ চরিত্রের ওপর। মনে রাখবেন, আপনার আয় যদি ভালো থাকে তবে কোনো গার্ডিয়ানই আপনার প্রেম করাতে আপত্তি জানাবে না।

মেয়েরা, আপনারা আবেগের বশবর্তী হয়ে অযোগ্য ছেলের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে ঘর ছাড়বেন না। নিজের ঘর অনেক নিরাপদ এই কথাটা সব সময় মনে রাখবেন। বাবা–মা সব সময় আপনাদের ভালো চিন্তা করেন। মনে রাখবেন, বাবা–মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে আপনি কোনোদিন সুখ–শান্তি পাবেন না।

মনে রাখবেন, যে পরিবারের মানসম্মানের দিকে খেয়াল রাখে না সে কোনোদিনও ভালো কিছু করতে পারে না।

আপনারা হয়তো বলবেন, এতো চিন্তা–ভাবনা করে প্রেম ভালোবাসা হয় না। কিন্তু কেন হবে না? একমাত্র মানুষই পারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। নিজের মন যা চায় সেটাই করবেন না। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করুন। দেখবেন সফলতা আপনার আসবেই।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# সায়

– আসমানি

খুব ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। কখনো জানিনি যা, তাই হয়েছে। আমার একটা ভালোবাসা হয়েছে। সে একটা পাগল, পুরোপরি পাগল। সপ্তাহে একটি মাত্র দিনে সে ছুটি পায়। আর এদিনেই সে নানান রকম পাগলামি করতে থাকে।

এক শুক্রবার সে ঠিক করলো ট্রেন জার্নি করবে। ঢাকা–আখাউড়া। সকাল সাড়ে ছয়টায় ট্রেন। অসম্ভব। আমি তো কিছুতেই যাবো না। আমার কাছে পৃথিবীর তিনটা কঠিন কাজের প্রথমটা হলো এই জেলখানার মতো উচু পাচিল ঘেরা বাসা থেকে বের হওয়া। তার উপর এতো ভোরে। অসম্ভব।

সে নাছোড়, যাবেই।

আযানের সময় ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে কোনো রকম গোসল করে ভেজা চুলেই কাপড় পরে নিলাম। যা সব সময় করি, চোখে সামান্য কাজল আর কপালে ছোট একটা টিপ একে তাড়াতাড়ি ব্যাগ গুছিয়ে ফেললাম।

রুমের দরজা খোলার ঠিক আগে কাজের মেয়ে উঠে গেল। যতো রকম দোয়া–দরুদ শিখেছি সব পড়া শুরু করলাম। তারপর তার চোখ বাচিয়ে ঠিক চোরের মতো জুতা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে সিড়ি বেয়ে নিচ তলায় নেমে, গেট খুলে সোজা দৌড়। আসার সময় বড় আপাকে বলে এলাম, আপা দুটা পায়ে ধরি। বাসা ম্যানেজ করিস। এই হলো আপা, যিনি এভাবেই আমাকে নিশ্চিত শাস্তির হাত থেকে হাজারোবার বাচিয়েছেন।

আর এই আমি আসমানি। ইউনিভার্সিটিতে এখনো আমাকে কাজের মেয়েকে নিয়ে যেতে হয়। আজ আমি একলা, এতো ভোরে, এভাবে অপরিচিত এক স্টেশনে যাচ্ছি। কেন? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। আমি যে ভালোবাসি, আমি যে তাকে বড় বেশি ভালোবাসি। একটা জীবনে আমার বিশেষ কিছু চাইবার নেই এই গোয়ার,অভিমানী, আধপাগলা মানুষটিকে ছাড়া।

স্টেশনে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখি তিনি নেই। রাগে, ভয়ে আমি কেদে ফেলেছিলাম। এতো বড় স্টেশন, হাজার হাজার যাত্রী কোথায় খুজবো তাকে? পৃথিবীতে ভালোবাসার এতো মানুষ থাকতে এমন বাজে একটা লোককে কোথা থেকে যোগাড় করেছি জানি না।

একটু পরেই তিনি এলেন এবং স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় বলা শুরু করলেন, বুঝলা ফকিরের কাছে টাকা ভাঙাইছি। শালা টাকা কম দিছে।

লজ্জা একটা জিনিস এই লোকের জীবনে হবে না। এতোটুকু অনুশোচনা নেই। হাসি হাসি মুখ করে কথা বলে যাচ্ছে। রেগে গিয়ে বললাম, চুপ করেন তো মুন্নাভাই।

তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমনই। কখনো আপনি, কখনো তুমি, কখনো মুন্না, কখনো মুন্নাভাই।

ট্রেন ছাড়ার পর যে দৃশ্যটা দেখলাম, তার জন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না আমার। অদ্ভুত সুন্দর একটা সকাল। ঢাকা শহরের ঘুম তখন সবে ভাঙছে। দোকানপাট একটু একটু করে খুলছে। চারদিকে সূর্যের সোনালি আভা। মৃদু মৃদু বাতাস, চুলের পানি পড়ে পুরো পিঠ ভিজে গিয়েছিল। কেমন একটু শীত শীত লাগছিল। হঠাৎ আমার মনে হলো ট্রেনটা যেন একটা শব্দ তুলে যাচ্ছে। আমি মেলাতে চেষ্টা করলাম, মুন্নাভাই, মুন্নাভাই। আমি বিস্মিত! হতবাক আ রে ট্রেনটা তো ঠিক তাই বলছে।

শহরতলি ছেড়ে আমাদের ট্রেন সবুজ বিস্তৃত ক্ষেতের পাশ গিয়ে চললো। এতো ভালো লাগছিল সব কিছু। মানুষের জীবনটা সত্যিই ভারী সুন্দর। তিনি গল্প করছিলেন। তিনি বরাবরই ভালো বলেন।

আমি চুপচাপ শুনছিলাম আর ভাবছিলাম। খুব আহামরি কিছু নয়। এক তলা, টিনের চালের ছোট একটা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, সামনে একটু বাগান। হাসনাহেনা, কামিনী ফুল গাছ, ফুটফুটে কয়েকটা শিশু। আর টুকটাক ঝগড়া।

হঠাৎ সে কাচুমাচু শুরু করে দিল। বুঝলাম, সে আমার হাত চাইছে। তার যখন হাত ধরতে ইচ্ছে হবে তখন সে একবার ধরবেই। প্রথমে একটু ইতস্তত করবে, তারপর ময়লা মুছে দেয়ার একটা ভান করবে, এক পর্যায়ে আমি আমার হাত বাড়িয়ে দেবো, সে তখন হাতটি নিজের হাতে নেবে। তার আবার খুব লজ্জা, হাত ধরেই উপরে আমার ওড়নার একটা অংশ দিয়ে রাখে। ভালো মানুষটির মতো মুখ করে রাখে আর ভেতরে আমার হাতের ছাল তুলে দেয়। পৃথিবীতে এই মানুষটার অধঃপতনের একমাত্র সাক্ষী আমি, ভাবতে বেশ লাগে।

আখাউড়া নামলাম এগারোটার দিকে। কিন্তু ফেরার ভালো ট্রেন নেই। লোকাল ট্রেনে সিট পাওয়া খুব কষ্ট। এখান থেকে সরাসরি বাস ঢাকা যায় না। সে ভীষণ চিন্তায় পড়লো।

স্টেশনের এক বৃদ্ধলোক পরামর্শ দিলেন এখান থেকে ধরখার এবং সেখান থেকে কুমিল্লার বাস ধরতে বৃদ্ধলোকটি নিজেই আমাদের নদীর ঘাট চিনিয়ে দিলেন।

ঘাট থেকে ইঞ্জিন নৌকায় ধরখার পৌছাতে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট লাগলো। পুরো সময়টাই নৌকার সকল যাত্রী আমাদের দিকে অবাক চোখে চেয়েছিল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলো, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো।

ধরখার ঘাটে নেমে পাকা রাস্তায় উঠে এলাম। একবার রাস্তার এই পাশে যাই আবার ওই পাশে যাই, অনেক বাস চলে যায়, কিন্তু থামে না।

অবশেষে কুমিল্লার একটি বাস থেমে আমাদের তুলে নেয়। লোকাল বাস। গুমোট গন্ধ। সামনের সিটে এক মহিলা বিড়ি খেয়ে ছাই আমার গায়ে ফেললে মুন্না বলে উঠলো, চাচি বিড়িও খান আবার ছাইও ফালান।
আমি হাসি চেপে রাখতে পারিনি।
বাসের রসিক হেলপার কুমিল্লা বলে কুমিল্লার আরো ছয় সাত মাইল আগে নামিয়ে দেয়। আমরা আবারও বিপদে পড়ি। এদিকে বাসার কথা ভেবে ভয়ে আমার বুক কাপছিল।
সে বললো, ভয় পেয়েও না, দেখো, ঠিক পৌছে যাবে।
সৌভাগ্যক্রমে একটা স্কুটার পেয়ে যাই। কুমিল্লায় যখন নামি তখন ক্ষিধেয় দুজনেই আধমরা। একটা ছোটখাটো হোটেলে খেয়ে সোজা ঢাকার বাস ধরি।
এরপরও এই লোকের তেলের অভাব হয়নি কখনো। বরং প্রতি ছুটিতেই সে দুঃসাহসিক অভিযানে মেতে ওঠে। আর আমিও হাজারো না না করে শেষ পর্যন্ত তাতে সায় দিই। কেন? তাকে যে বড় ভালোবাসি।

*মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে*

## নীল পাখি

– রোহিনী

কথা দিয়ে তুমি কথা রাখোনি। হাতে হাত রেখে বলেছিলে, আমি আসবো। অপেক্ষায় থেকো, আসবো।
মেঘভারে আকাশ নত ছিল মাঠে। সাক্ষী ছিল নদী, কাশবন, শরতের কোটি প্রথম ফুলের সুবাস।
অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি এলে না। এক কিশোরীর প্রথম ভালোবাসার ফুল ঝরে গেল। বেদনার কতো দিন গিয়েছে আমার। কতো কান্নার জল মিশে গেছে কীর্তনখোলায়। জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাওয়া কতো রাত নির্ঘুম কেটেছে আমার।
হৃদয় ভাঙে কিশোরীর। তেতুলিয়া ভাঙে পথঘাট, লোকালয়। কলংকের জলে সেই ডুবিয়ে আমায়, পালিয়েছো তুমি কবে। স্মৃতির অর্গল খুলে নিঃশ্বাস টানি আজও ভালোবাসার সৌরভে।
যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ ভালোবাসার দুঃখ আমার নেই। চারদিকে অনেক ভালোবাসা। এ ভালোবাসা আমায় জাগিয়ে রেখেছে। তুমি যেখানেই আছো, নির্মল ভালোবাসায় স্নাত হও অহরহ। ভালো থেকো তুমি।

*ঢাকা থেকে*

## হাবা

– সবুজ

রাত বারোটার দিকে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই ওপার থেকে ভারী নারী কণ্ঠের প্রশ্ন, এখানে সবুজ থাকেন?
ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি। হাই তুলতে তুলতে বললাম, সবুজ বলছি।
হাবা কোথাকার! কখন থেকে রিং হচ্ছে। কবে থেকে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েও পাচ্ছি না। কেমন আছিস?
অনেকগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে। বিস্ময় অবিভূত কণ্ঠে জানতে চাইলাম, কে বলছেন?
ও এখনো চিনতে পারিসনি, হাবা কোথাকার? আমি তোর স্মরণীআপা।
ওপার থেকে অনর্গল কথা হচ্ছে। আমি এতোটাই আশ্চর্য হয়েছি যে, নিজের অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। অদ্ভুত রকমের ভালোলাগার ঢেউ আমার শিরা-উপশিরায় বইতে লাগলো। প্রায় সাত বছর পরে স্মরণীআপার চিরাচরিত সম্বোধন *হাবা* শুনেও তাকে চিনতে পারিনি। তার মুখে হাবা ডাকটা শুনতে ভালোই লাগে। গত সাতটা বছরে তার ও আমার জীবনে কতো কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তারপরও সেই দিনগুলোর

অনুভূতির স্মৃতি এতো সজীব, এতো টাটকা মনে হচ্ছিল যে, আমি একটা মধুর স্বপ্ন দেখছি। এতোদিন বাদে আমার মনে ত্বরিত প্রবাহের মতো স্মরণীআপার কতো স্মৃতি আসা–যাওয়া করতে লাগলো।

ম্যাট্রিক পাস করার পরে মিষ্টি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম স্মরণীআপাদের বাড়িতে। মিষ্টির প্যাকেট দেখে স্মরণীআপা জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে হাবা, তোর হাতে কিসের প্যাকেট?

আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর, মিষ্টি।

কেন রে? কোনো সুখবর আছে নাকি?

আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছি।

অমনি স্মরণীআপার দস্যিপনার স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগলো।

ওমা! ভাই, ভাবী দেখে যাও, আমাদের হাবা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে।

স্মরণীআপার চেচামেচিতে তারা দৌড়ে এলেন এবং আমার দাড়িয়ে থাকা দেখতে লাগলেন অপলক দৃষ্টিতে। আমার যে কি অস্বস্তি লাগছিল! মনে হচ্ছিল তারা আমার শরীরের রক্ত প্রবাহ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন। স্মরণীআপার মা পরীখালা আমার মায়ের ফুপাতো বোন ও সমবয়সী এক আত্মীয়, বান্ধবী। খালার নামের সঙ্গে তার চেহারার অন্ত মিল। বড়লোকের মেয়ে, বিশাল জমিদার স্টাইলের বাড়িতে পরীখালাকে গল্প–উপন্যাসের রাজ রানীর মতোই মনে হতো। খালার আট ছেলেমেয়ের মধ্যে স্মরণীআপা সবার ছোট। আমার থেকে স্মরণীআপা আট মাসের বড়। সবার স্নেহ, ভালোবাসায় অস্থির চিত্তের অধিকারিণী। খালার ছেলেমেয়েগুলোর যেমন চেহারা তেমনি মেধাবী। উপরওয়ালা তাদের সব কিছুই পূর্ণ করে দিয়েছে।

স্মরণীআপার সান্নিধ্য আমার ভালো লাগতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের ভয়–আশংকা আমার ভেতরটা দুমড়ে–মুচড়ে দিতে চায়। তবুও স্মরণীআপার সঙ্গে থাকার লোভ সামলাতে পারছিলাম না। আমি মনে মনে স্মরণীআপাকে নিয়ে কতো অল্প–মধুর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

কলেজে ভর্তি হয়ে আর স্মরণীআপাদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। কল্পনায় সব সময়ই আমার পাশে ছায়ার মতো তিনি বিচরণ করতেন।

ইউনিভার্সিটির ছুটির ফাকে গেলাম স্মরণীআপাদের বাড়িতে। এতোদিনে আমার হাবা–গোবার চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। ছোটবেলার নিত্যদিনের অভাবে যখন খালার কাছে মলিন মুখ নিয়ে সাহায্য চাইতে যেতাম সেই মলিন মুখেরও পরিবর্তন হয়েছে বড় ভাইয়ের চাকরির সুবাদে।

চেহারায় পরিবর্তনের কারণে হোক কিংবা যে জন্যেই হোক, ওই বাড়ির সবাই আমাকে অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

মুখচোরা রোগে আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, কথা বলতে পারছিলাম না। আমার দুই চোখ খুজতে লাগলো ভালোলাগার মানুষটিকে। এক সময় খুব সাহস নিয়ে খালাকে প্রশ্ন করলাম, স্মরণীআপা কই?

সে নেই। গিয়েছে তোর মেজআপার বাড়িতে।

খালার উত্তরটা আমার মনের দেয়ালে প্রতিধ্বনির মতো বার বার আছড়ে পড়তে লাগলো, সে নেই। এতোদিন পরে যাকে দেখার উদ্দেশ্য, মনের কথাটা সাহস করে বলার জন্য এসেছি, অথচ তিনি নেই।

নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করলাম কি হবে ভেবে? তার আর আমাতে অনেক তফাত। আমার এই দুর্বলতা যদি কখনো ধরা পড়ে তবে এ বাড়ির কারো সামনে দাড়াতে পারবো না। এরা সময়ে অসময়ে কতো উপকার করেছে। এক ধরনের আচ্ছন্নে রাতটা কাটালাম।

আমার কপাল ভালো। পরদিন সকালেই স্মরণীআপা এসে হাজির। আমাকে দেখেই তার সেই পুরনো অভ্যাস, পুরানো অভ্যর্থনা, আ রে, আমাদের হাবা! তোকে তো প্রায় নায়ক বরাবর লাগছে দেখতে। কখন এসেছিস? এতোদিন কোনো খোজ নেই কেন? তোর পড়াশোনা কেমন চলছে? এভাবে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। আমি এমনিতেই কম কথা বলি। তার উপর এতোগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে। নির্বাক হয়ে চোখ দিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এক সময় অপলক দৃষ্টিতে থাকিয়ে আছি তার দিকে।

স্মরণীআপা চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি দেখছিস?

উত্তর দিতে পারলাম না।

আপা বললেন, তুই যদি আমার থেকে বড় হতিস!

বড় হলে কি হতো?

হাবা! তোর মাথা হতো। বলেই স্মরণীআপা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার বেরিয়ে যাওয়ার রিনিঝিনি শব্দ আমার মনে অপূর্ব আহ্বান ভেসে আসতে লাগলো। আমার দৈনন্দিনের প্রায় গতিহীন জীবন আরো অথর্ব হয়ে যেতে লাগলো, স্মরণীআপার আহ্বানে। তবুও কিছু মধুর স্মৃতিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আর কি।

এরই মধ্যে স্মরণীআপার বিয়ের সংবাদ পেলাম। আমার ভীতু হৃদয়ে কে যেন ইনজেকশনের সূচ ফুটিয়ে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরাতে লাগলো। স্মরণীআপার বিয়ের সংবাদে আমার চোখ দিয়ে পানি বের হয়নি ঠিকই কিন্তু এক দলা কষ্ট হৃদয়টাকে মোচড়াতে লাগলো।

বিয়ের দুই তিন দিন বাকি থাকতেই গেলাম সেখানে। আমাকে দেখে তার চিরাচরিত হাবা ডাক আর শুনতে পেলাম না। হাত ধরে টানাটানিও করলেন না। তার চোখেমুখে অন্য রকম অসহায়ত্ব দিয়ে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক নিয়েই টানাটানি শুরু করলেন।

এদিকে বিয়ের আয়োজন চলতে লাগলো জোরেশোরে। আমিও ফুট-ফরমায়েশ খাটতে লাগলাম। স্মরণীআপা অনেকটা বাধ্য মেয়ের মতো নিজেও কিছু কিছু কাজে মন দিলেন।

বিয়ের ঠিক আগের দিন স্মরণীআপা আমাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সবুজ, তোর কষ্ট হচ্ছে না?

এই প্রথম তার মুখে আমার নাম শুনলাম। আমার ওই সময়ের অনুভূতি প্রকাশ করার মতো ভাষা জানা নেই। অথচ আমার অব্যক্ত কথাগুলো আমাকেই নির্মমভাবে দংশন করতে লাগলো। কোনো জবাবই আমার কষ্টটার পরিমাপ করতে পারবে না।

স্মরণীআপার বিয়ে হয়ে গেল। যাওয়ার সময় আমার কাছে বিদায় নিতে এসে চোখে পানি, মুখে হাসি ফুটিয়ে পুরনো অভ্যাস মতো মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, হাবা কোথাকার, ভালো থাকিস।

স্মরণীআপা চলে গেলে এতো ভিড়ের মধ্যে ঘরের ছাদে গিয়ে নিজেকে একা করতে চাইলাম। একটা শূন্যতা, একটা পিপাসা বুকের মধ্যে এমনভাবে আছড়াতে লাগলো যে, আমার দুই চোখ দিয়ে গরম অশ্রু টপ টপ করে পড়তে লাগলো।

অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত আমার সেই প্রথম ও শেষ কান্না।

স্মরণীআপা এখন বিদেশে আছেন তার স্বামীর সঙ্গে।

সব কিছু পেয়েও তার কথাতে অপ্রাপ্তির সুর শুনতে পেলাম। স্মরণীআপাকে বললাম, তোমার শেষ কথা *ভালো থাকিস*-এর বারতা নিয়ে হয়তো আমি ভালোই আছি।

*গাংনী, মেহেরপুর থেকে*

## চরিত্রহীন

আমার ফুপুর বড় ভাসুরের মেয়ে রেবা ও রেখা। তারা যমজ দুই বোন।

ফুপুর বাড়ি এবং আমাদের বাড়ি একই জেলা শহরে। ছোটবেলা থেকেই ফুপুর বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত। রেবা এবং রেখা দুই বোনই দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী, অন্তত আমার চোখে। তবে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক সংজ্ঞায় যা বোঝায় তাতেও তারা সুন্দরী। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ, খাড়া নাক, ডাগর আখি, পীনোন্নত পয়োধর, ক্ষীণ কোটি, সরু নিতম্ব। দুই বোনের মধ্যে ভালোবাসি রেবাকে। সেই ক্লাস নাইন থেকে। ওরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়তো। তখনো যৌন বিষয়ে কিছুই জানি না। তবু কি যে এক আকর্ষণ অনুভব করতাম রেবার প্রতি। কতো দিন-রাত তুমি ছিলে আমার খেলার সঙ্গী। তবে দীর্ঘ দিন আমার মনের একান্তে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার ভালোবাসা।

রেবা-রেখার পরিবারে আমি তাদের পরিবারের একজন হয়েই ছিলাম। রেবাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে বেরিয়েছি। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা যখন খুশি। কিন্তু দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে গেছে তাকে আমার ভালোবাসার কথা বলা হয়নি।

এভাবে সময় গড়িয়েছে। শিক্ষা জীবন শেষ করে চলনসই একটি চাকরি করছি। রেবাও কলেজ জীবন শেষ করে অন্য একটি জেলা শহরে একটি এনজিওর চাকরি নিয়ে আছে। আমি সময়ে-অসময়ে তার কাছে যাই, চিঠিপত্রের যোগাযোগও আছে। তবুও তাকে বলা হয় না আমার না বলা কথা।

এদিকে বাড়িতে রেখা একা। আমি ফুপু বাড়ি যাই রেখার সঙ্গে গল্প করি। বুঝতে পারি রেখা আমার প্রতি আকৃষ্ট। আমি এড়িয়ে যাই। রেবার থেকে এক মিনিট পরে জন্মগ্রহণকারী রেখাকে প্রেমিকার ছোট বোনের দৃষ্টিতেই স্নেহ করি।

এক নিরিবিলি পরিবেশে এই জীবনে প্রথম রেবাকে আমার প্রেম নিবেদন করি। তার হাত দুটি ধরে গভীরভাবে বলি, রেবা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে রেবা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বোকা হয়ে যাই। রেবাকে বলি, এতে হাসার কি আছে! তুমি একটা কিছু বলো।

সেদিনের মতো সে হাসতে হাসতেই আমার সামনে দিয়ে চলে যায়।

আমার অযোগ্যতা খুজে ফিরি। আমি দেখতে নায়কের মতো না হলেও কুদর্শন নই। লেখাপড়ায় রেবার চেয়েও ভালো ছিলাম। ভালো চাকরি করছি। আমি খোজ নিয়ে দেখেছি রেবার আর কোনো পছন্দের মানুষও নেই। তাহলে? রেবা তো আমার কাছ থেকে কোনো খারাপ আচরণ পায়নি। কতো রাতের বেলা তাকে পাশে বসিয়ে রিকশায় যাতায়াত করেছি। কোনো দিন তার পিঠেও হাত রাখিনি। একজন নারীকে যে সম্মান দিতে হয় তারচেয়েও বেশি তাকে দিয়েছি। *আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছি দান। তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ।*

আমি আরো কয়েকবার রেবাকে আমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছি। সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, রেবা আমার সামনে নিজেকে দেখিয়েছে। আমার সামনে দিয়ে শরীর বেকিয়ে হেটে যায় নিতম্বে ঢেউ তুলে। অকারণে তার বুকের ওড়না পড়ে যায়। তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি একদিন মরিয়া হয়ে আমার দুই হাত দিয়ে তার মাথা ধরলাম। কাতর স্বরে বললাম, রেবা শুধু একটিবার আমাকে তোমার কপালে চুমু খেতে দাও।

তার সম্মতির অপেক্ষা না করে গভীরভাবে তার কপালে চুমু খেলাম।

সে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমার মধ্যে তখন একটিই চিন্তা। যে কোনোভাবে হোক আমাকে রেবার দখল নিতে হবে, রেবা আমার। রেবা শুধু আমার। রেবা আমার। পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের দিকে আমার তাকাতে ইচ্ছা করে না। কি ভুল! আমার দৃষ্টি যদি আরো ছটফটে হতো তাহলে আমাকে এতো কষ্ট পেতে হতো না।

এরপর যখনই নিরিবিলি পরিবেশে সুযোগ হয়েছে রেবার সঙ্গে আমার কোনো ভাষা বিনিময় হয়নি। শুধু তার মাথাটি আমার দুই হাত দিয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছি। না, তার শরীর ঘাটিনি। কিন্তু ইচ্ছা করলেই পারতাম। কেননা বুঝতে পারতাম সে দুর্বল হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি তো তাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করতাম। শারীরিক পবিত্রতায় বিশ্বাস করতাম।

হয়তো নারী চরিত্র বুঝতে পারি না। রেবা কি চায়? আমাকে সে অপছন্দ না করলে সেটা তো স্পষ্ট করে আমাকে বলতে পারে। কিন্তু তাও বলে না। আমার সামান্য আদর যখন সে গ্রহণ করেছে তখন তো আমাকে একেবারে অপছন্দ করার কথা না। প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে আমাকে ও বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গে নিয়েছে। তার প্রয়োজনীয় সব কিছু আমি করে দিয়েছি। কিন্তু তবুও তার মন পাইনি। আমাকে যেটুকু সে দিয়েছে (শুধু কপালে চুমু খাওয়া) সেটা মনে হয় তার কাজ উদ্ধার করার জন্য। আমিও তার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি এ জন্য যে, তাতে যদি আমি যেটুকু পেয়েছি সেটুকু হারাই। আমার এ একতরফা ভালোবাসার পরিণতি কি হবে জানতাম না। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি হয়তো জীবন সঙ্গী হিসেবে রেবাকে একদিন পাবো।

কিন্তু আমি নির্বোধ প্রেমিক, বুঝতে পারিনি রেবা আমার কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছিল। নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার সংবাদ চাপা থাকে না। শুনতে পাচ্ছিলাম রেবার এনজিও–র এক কর্মকর্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কোনোদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। কেননা সেটা আমার রুচিতে বাধে। বিশ্বাস করি, প্রতিটি নারী, পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তার পছন্দের মানুষকে বেছে নেয়ার। কিন্তু প্রতারণা কেন?

এদিকে বাড়িতে রেখা একা থাকে। তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। রেবা ঘোষণা দিয়েছে, সে এখন বিয়ে করবে না।

সে চাকরি করে। এটুকু স্বাধীনতা তো তার থাকতেই পারে। কিন্তু রেখার অভিভাবকরা রেখার বিয়ের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

একই বাড়িতে দুই বোন। কারোর বিষয়ে এতো লুকোছাপা নেই। রেখা জানে আমি রেবাকে ভালোবাসি। কিন্তু রেবা আমাকে ভালোবাসে না। রেখা কখন, কেমন করে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে বুঝতে পারিনি। একদিন নির্জন পরিবেশে রেখা আমার হাত দুটি ধরে হু হু করে কেদে ফেললো।

সব কিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কি হয়েছে? এমন করো না।

সে এবার ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেদে ফেললো। বললো, আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

আমার হাত তার মুখ, বুকে ধরে বললো, রেবার যা আছে, আমার তার কি নেই বলুন? আমাকে একটু ভালোবাসা দিন, একটু আদর করুন।

রেখার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এলাম।

প্রেম, ভালোবাসা আগুন লাগা ধোয়ার মতো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আমি রেবাকে চেয়েছি পাইনি। রেখা আমাকে চেয়েছে পায়নি। কিন্তু পরস্পরের সম্পর্কের কথা কারো কাছে অজানা থাকেনি।

জানি না কি এক অজানা কারণে রেবা আমার প্রতি বিদ্বেষবশত সবার কাছে আমার সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছে, তিনি তো একটি চরিত্রহীন। আমি অনেক আগেই জানতে পেরে তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকেছি।

আমি রেবাকে সম্মান দিয়ে চরিত্রহীন হয়েছি। আমি সুযোগ পেয়ে রেবাকে ভোগ না করেও চরিত্রহীন হয়েছি।

*নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# জেদ

– শামীম

বাবুলভাই, তুমি এতো দেরিতে এলে! সেই কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

দরজা খুলে শম্পার কথায় বিভ্রান্ত হলাম। বুঝতে পারলাম না তাকে আমি কবে বলেছিলাম আজ আসবো। গত ছয় মাস কুমিল্লায় আসিনি। আর শম্পার সঙ্গে আমার এক মাস কথা হয়নি।

আমি তোকে কবে বললাম আবার যে, আজ আসবো। ভেতরে ঢুকে সোফায় হেলান দিয়ে বললাম।

শম্পা হি হি করে হেসে উঠলো। বললো, তুমি বলোনি ঠিকই তবে আমার মন বলছিলো তুমি আজ আসবে। বিশ্বাস না হলে মাকে জিজ্ঞাসা করো।

যা। বিশ্বাস করলাম। এক মগ ঠাণ্ডা বরফ দিয়ে পানি নিয়ে আয়। মামিকে বল আমি এসেছি।

মা, বাবলুভাই এসেছেন। বলেই সে ভেতরে গেল।

শম্পা সেই যে গেল দশ মিনিট হতে চললো পানি নিয়ে আসার নাম নেই। মামিকে বলতে যাবো, এমন সময় সে পানির সঙ্গে নাশতা নিয়ে ঢুকলো।

শম্পাকে দেখে চমকে উঠলাম। সুন্দর করে সেজে এসেছে ও।

কিরে, এমন করে সেজেছিস যে? কোনো ফাংশন আছে নাকি?

না। তোমার সঙ্গে ঘুরবো বলে সেজেছি।

কি বললি, আমার সঙ্গে ঘুরবি মানে? অসম্ভব, কিছুতেই আজ বের হতে পারবো না। বড্ড টায়ার্ড আমি।

তুমি বললেই হলো! তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। সকাল থেকে প্ল্যান করে রেখেছি কি শাড়ি পরবো, কোথায় যাবো।

মামি তোমার মেয়ে কি বলছে এসব?

কি জানি, সকালে ঘুম থেকে জেগেই বললো তুমি আসবে, তোমার পছন্দের সব কিছু রান্না করেছে ও। দুপুরে তুমি আসছো না দেখে কান্না শুরু করলো।

আশ্চর্য। আমি যে আজ এদিকে তা আসবো নিজেই ভাবিনি। হঠাৎ করেই সকালে প্ল্যান হলো কুমিল্লা আসার। আমার কম্পানি ক্যান্টনমেন্টের কাছে জায়গা নিয়েছে হোটেল কিনবে বলে। সে জন্যই আমার আসা। আজ রাতেই তো চলে যাবো।

ইশ, চলে যাবো বললেই হলো! তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে?

এখন চলো বের হই। রাতে মায়ের সঙ্গে কথা বলো।

পারবো না, তুই একা যা। বড্ড ক্লান্ত আমি।

তুমি মোটেই ক্লান্ত না। তুমি যদি না যাও তাহলে কেদে ফেলবো। বলেই শম্পা কান্না জুড়ে দিল।

মহা ঝামেলা দেখছি! শম্পা এমন পাগলামি শুরু করবে ভাবতেই পারিনি। ওকে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। রিকশা ঠিক করা নিয়ে সমস্যা হলো। ঘণ্টা চুক্তিতে কেই রাজি হচ্ছে না। আর যারা হচ্ছে সব ইয়াং বয়সের। শম্পার আবার ইয়াং রিকশাচালক পছন্দ না। ওরা যথেষ্ট ফাজিল প্রকৃতির হয়। মাঝ বয়সী রিকশাচালক ভালো হয়। অবশেষে রিকশা ঠিক হলো।

রেসকোর্স থেকে রিকশা কান্দিরপাড় হয়ে হাউজিং স্টেট, এয়ারপোর্ট, টমছম বৃজ হয়ে আবার কান্দিরপাড় এলো। একটা ফাস্ট ফুড দোকানে হালকা নাশতা করলাম। মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় গেল। শম্পার বকবকানিতে মন্দ লাগছিল না এ রিকশা ভ্রমণ।

মিতু থাকতে এভাবে কতো ঘুরেছি।

রিকশায় উঠে শম্পা আমার বাম হাতটা ওর হাতে নিল।

ওর দিকে তাকালাম। কিছু বললাম না।

বুঝলাম সে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রথম থেকেই খেয়াল করছি, ও আমাকে কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলতে পারছে না। কোনো প্রেমঘটিত সমস্যা না তো! এ বয়সের মেয়েরা এসব সমস্যায়ই পড়ে বেশি যা বাবা–মাকে বলতে পারে না।

কিরে, কিছু বলবি?

না।

কাপ্তান বাজার হয়ে গোমতি নদীর পাড়ে উঠলো রিকশা। চারদিক অন্ধকার। রিকশা থেকে নেমে একটু সামনে গিয়ে বসলাম দুজন।

বাবলুভাই, তোমার কাছে একটা জিনিস চাইবো, দেবে আমায়।

কি জিনিস বলো। আমার যদি সাধ্য থাকে তাহলে অবশ্যই দেবো।

আমাকে ছুয়ে প্রমিজ করো।

ঠিক আছে করলাম। বল।

তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি। তুমি যদি বলো আজই।

শম্পার কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বলছে কি মেয়েটা!

একে তো ওর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য অনেক। তার উপর আমি বিবাহিত। এটা কি বলছে ও। মাথায় নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে ওর।

কি হলো, কথা বলছো না কেন?

শম্পা, তোর শরীর ভালো আছো তো? কি আবোল–তাবোল বকছিস?

হ্যা, আমার শরীর–মন সবই ভালো আছে। এখন তুমি বলো আমাকে বিয়ে করবে কি না।

অবশ্যই না। তুই তো জানিস আমার সব কিছু। সব জেনেশুনে কেন তুই পাগলামো চিন্তা করছিস।

বাবলুভাই, আমি যখন ছোট থেকে বড় হলাম, প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে বুঝতে শিখলাম তখন থেকে আমার হৃদয়ের বিরাট একটা অংশ জুড়ে তুমি আছো। আজকের মতো হঠাৎ করেই তুমি আমাদের বাসায় এসে হাজির হও। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। এসেই বললে *চল তোকে নিয়ে আজ সমস্ত শহর রিকশায় করে ঘুরে বেড়াবো।*

তুমি সেদিন আমাকে নিয়ে রিকশায় অনেক দূরে চলে গিয়েছিলে। বলেছিলে, তোমার ভালো লাগা, ভালোবাসার কথা। আমার কচি হৃদয়টা তুমি নাড়িয়ে দিয়েছিলে। বহুবার তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আমার ভালোবাসার কথা। কিন্তু পারিনি। কারণ, তোমার পছন্দ মতো মানসিকভাবে তৈরি হতে পারিনি। যখন মনে হলো আমি সম্পূর্ণ তোমার মনের মতো হয়েছি তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। তুমি হুট করে মিতুআপুকে বিয়ে করে ফেললে। ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম তোমার বিয়ের কথা শুনে। কতো ভেবেছি আত্মহত্যা করবো, পারিনি। মরে গেলে তো তোমাকে দেখতে পাবো না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। মৃত্যু তো মানুষকে আড়াল করে দেয়।

শম্পার কথা শুনে আমার ভেতর কেপে উঠলো। কথার খেই হারিয়ে ফেললাম। সে আমাকে এতো ভালোবাসে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। বয়সের দিক দিয়ে আমি তার দশ বছরের বড় ও বিপত্নীক। আমার একটা তিন বছরের মেয়ে আছে। যদিও আমার এ বাচ্চা মেয়েটার জন্মের এক বছর পর মিতু মারা যায় এক সড়ক দুর্ঘটনায়। মিতুর স্মৃতি আর মেয়েটাকে নিয়েই আমার জীবন কাটছিল।

বাসার সবাই চাপ দিচ্ছিল দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে। আমার আর সংসারের রুটিনমাফিক ঝুট-ঝামেলায় যেতে ইচ্ছে হয় না। মিতুর মতো এ পৃথিবীতে আমাকে বোঝার মেয়ে তো খুজে পাওয়া যাবে না। বেশ আছি আমি। বাসার অন্যরা মেয়েটাকে সামলাচ্ছে আর আমি ...।

কি হলো, কথা বলছো না কেন? চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে বললো শম্পা।

কি বলবো। যা বলার তো বলেছি।

তুমি আমাকে ছুয়ে কথা দিয়েছিলে।

দিয়েছিলাম। অন্য কিছু চাও, আমি দেবো, প্রয়োজনে আমার জীবন দেবো।

তোমার জীবন দিতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে তোমার পাশে থাকার অনুমতি দাও।

বাদ দে তো। চল বাসায়। তোর জন্য আমার চেয়ে ভালো, সুন্দর, স্মার্ট ছেলে খুজে দেবো। আমি আর সংসার করবো না। সে ইচ্ছাও নেই। আমার সব ভালোবাসা, ভালো লাগা মিতু সাথে করে নিয়ে গেছে।

বাসা পর্যন্ত শম্পা কোনো কথা বলেনি। রাতে ভাত খাওয়ার পর আমার রুমে এসে বললো সকালবেলা তুমি আমার মরা মুখ দেখবে। আমি মরে প্রমাণ করে দেবো আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শম্পার কথায় হাসলাম। বললাম, কিভাবে মরবি, বর্ণনাটা লিখে দিস, রেসিপিটা অন্যদের কাজে লাগবে। মৃত্যু এতোই সহজ?

ভোরের দিকে মামি-মামা, অন্যদের চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শম্পার রুম থেকে কান্নার শব্দ আসছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি শম্পা গোংরাচ্ছে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে, চোখগুলো বেরিয়ে আসছিল। ভয়ঙ্কর অবস্থা!

চারদিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকার পর বেচে উঠলো। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল শম্পার। পয়জনের পরিমাণ এতো বেশি ছিল যে, তিন চার ঘণ্টা লাগলো ওয়াশ করতে। তার উপর গলা, মুখে ঘা হয়ে গেছে। ওর জন্য মা-মামির সামনে যেতে পারতাম না। যদিও ওরা আমাকে কিছু বলতো না।

যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হলো সেদিন ওকে বললাম, এ পৃথিবীতে মানুষ বোকা হয় জানতাম, এতো বোকা হয় আমার জানা ছিল না। তুই যদি মারা যেতিস তাহলে আমার কি হতো বলতো?

শম্পা আমার কথায় কেদে ফেলে। বলে, *তুমি যদি আমাকে আগে এ কথা বলতে তাহলে...।*

শম্পার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমাদের দুইটি সন্তানও আছে। শম্পার ভালোবাসায় আমি ভুলে গেলাম মিতুকে। আমার মেয়েও তার নতুন মাকে পেয়ে খুব খুশি। অবশ্য সে জানবে কিভাবে? তাকে তো বলাই হয়নি।

*শুয়াগঞ্জ, কুমিল্লা থেকে*

## বিরহে নয়

– মোহসীন ভুঞা

প্রায় এক যুগ আগে বিটিভির কোনো এক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে প্রয়াত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী আবদুল আহাদকে তার চিরকুমার থাকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার অনুরোধ করা হয়। তিনি অত্যন্ত বেদনাহত ও আবেগজড়িত কণ্ঠে সংসারি না হওয়াকে জীবনের চরম ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এবং তার মতো ভুল করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

এ রহস্য অনেকটা আড়ালে রয়ে যাবে। যারা জীবনের কোনো এক দুর্বল মুহূর্তকে উপলক্ষ্য করে কিংবা ত্যাগের মহিমায় বিলীন হয়ে একাকীত্বকে বেছে নিয়েছেন, জীবন সায়াহ্নে এসে গোপন কোনো ব্যথা তারা অনুভব করেছেন কি না?

ভালোবাসার অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে অভিমানী হয়ে অথবা বিচ্ছেদে বিমুখ হয়ে বিরহকে সঙ্গী করে পথ চলা যারা শ্রেয় মনে করেন তাদের মগ্নতা ভাঙতে বাধ্য। পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জীবন যার যার, তার তার। বৈরাগ্য হচ্ছে বেচে থাকা ও প্রকৃতির বিপরীত স্রোত।

ছাত্র অবস্থায় ভিয়েনা–র এক কফি হাউসে কাজ করার সময় দেখেছি, প্রায় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে কর্নারের এক টেবিলে কফি নিয়ে এক যুগল বসতো। তাদের ভালোবাসার প্রকাশ হৃদয়ে রিনি–ঝিনি ভাব ধরাতো। হঠাৎ দেখি শুধু মেয়েটি কফি নিয়ে মাথা নিচু করে সেই টেবিলে বসে আছে। পাশের টেবিলে কফি সার্ভ করে তার টলমলে চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় হ্যালো বলতেই গাল গড়িয়ে পানি পড়ে। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা না করেই জানালো, তার বন্ধু তাকে আর ভালোবাসে না। নতুন বান্ধবী পেয়েছে সে।

এ পরিস্থিতিতে কি বলতে হয় ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই কোনো রকমে সরি বলে ফিরে আসি। দুই সপ্তাহ না যেতে দেখলাম, একই টেবিল, একই মেয়ে আগের চেয়ে অধিক উচ্ছলতায় অন্য এক বন্ধুকে নিয়ে মুখর হয়ে আছে। একেই বলে জীবন! কারো জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। আবেগে নিজেকে কক্ষচ্যুত করে না। প্রতিশোধ স্পৃহায় এসিড ছোড়ে না। নিসঙ্গতাকে নিজের ভুবন মনে করে মাদকে নিজেকে ধ্বংস করে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে প্রয়াত নায়ককে উদ্দেশ্য করে শেষ লাইনগুলো এ রকম – *তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত পূর্ণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালোবাসিতে চাহিবে না।*

যে শৈবলিনীকে স্বর্গে পেলেও ভালোবাসতে ইচ্ছা হবে না পৃথিবীতে তার বিরহ বেদনায় সর্বস্ব ত্যাগী হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া মোহাবিষ্ট বৈ কিছু নয়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে যে সৈনিক প্রেয়সীকে কাছে টেনে বলেছে, *যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে নতুন করে জীবন শুরু করো, আমি তোমার সুখী জীবন চাই,* তার ভালোবাসার গভীরতা মাপার যন্ত্র অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। এক জীবনে দুবার জন্ম অসম্ভব। কিন্তু এক জীবনে প্রেয়সী, মানসী ও জীবনসঙ্গীকে ভালোবাসা যায়।

ফুল, পাখি ও শিশুপ্রেমী জীবনানন্দ দাশ প্রশ্ন রেখে গেছেন,

*নহি তার শান্তির সময়?*
*কোনো দিন ঘুমাবে না?*
*ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ পাবে না কি?*
*পাবে না আহ্লাদ মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!*
*মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!*
*শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!*

তাই জীবনের পূর্ণতা শুধু ভালোবেসে যাওয়ায়, বিরহে নয়। বিরহ নিয়ে যায় দূরে, ভিন্ন স্রোতে, নক্ষত্রহীন অন্ধকারে, চাদ বিহীন অমাবস্যায়।

*ভিয়েনা থেকে*
mohsinbhuian@msn.com

# চিন্তা ও চিতা

– পাগলি

প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে। সেক্ষেত্রে আমার জীবনে ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। আমার পাগলাকে আমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। এবং সারা জীবন ভালোবেসে যাবো। অবশ্য প্রথমে সে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু কখনো কল্পনা করিনি যে আমার জীবনে এতো সব ঘটে যাবে।

আমাদের প্রেমের শুরু ২০০১ সালের ৩০ মে মাসে। এরপর প্রতিটি মুহূর্ত যে কিভাবে কাটিয়েছি! আমারও দুর্বলতা ছিল। তা না হলে কখনো ভালোবাসা হয় না। বকু–কে আমি ভালোবাসি বলে যে তার প্রশংসা করবো তা নয়। বকু যে এতো ভালো সেটা বলে প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষত তার তার মন, বাশি বাজানো এবং মানুষকে অতি সহজে পটিয়ে ফেলা।

আমার বকু আমার কথা বলার সময় খুব ক্ষেপাতো। মনে হয় আমার জিভে কোনো ত্রুটি ছিল। আমি 'ভ'–এর স্থলে 'ব' উচ্চারণ করতাম। শুধু সে না, তাদের বাসার সবাই। আর আমার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল, অল্পতেই রাগ করতাম এবং কান্নাকাটি করে একাকার করে ফেলতাম। আবার অল্প সময়ের মধ্যেই হাসতে পারতাম। এটা আমার একটা খুব ভালো গুণ ছিল।

পরে আস্তে আস্তে বকুর সব কিছু ভালো লেগে গেল। তাকে আমি পাগলা বলতাম। তবে চিঠি লেখার সময় অবশ্য। বকুর সঙ্গে আমার অনেক কিছুর ব্যবধান। তবুও ভালোবাসার সামনে সব কিছু বেমানান। সত্যি কথা হলো, আমাদের ভালোবাসা এখনো টিকে আছে সেটা শুধু আমার জন্য। কারণ, সে কি এখন আমাকে সত্যিকার ভাবে পছন্দ করে কিনা বুঝতে পারি না। তার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন তার মন বোঝার মতো সাধ্য এই পৃথিবীতে কারো হবে বলে মনে হয় না। তখন বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। যখন ফোনে কথা বলি তখন মনে হয় কতো দিনের অপরিচিত এবং তৃপ্তি পাই না। মনে হয় কথার মধ্যে কতো রহস্য আছে। একটু রাগও করি। পরে খারাপ লাগলে নিজেই আপোস হয়ে যাই।

বকু–কে আমি যে এতো পছন্দ করি সে কি কখনো বুঝতে পারে কি না এখনো জানতে পারলাম না। তাকে ভুলে যাবো বলে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু বেশি দিন থাকা যায় না। তবে এক সময় অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, কখনো কথা বলবো না। শুধু মরার আগে তাকে একবারের জন্য শেষ দেখা দেখবো। কিন্তু তার কারণে রাগটা বেশি দিন টিকলো না। এমনভাবে ফান করা শুরু করলো যে, আর কথা না বলে থাকতে পারলাম না।

তার সঙ্গে কথা, ফোন না করে মাত্র চার মাস ছিলাম। যখন মনে হতো তখন শুধু নেগেটিভ দিক চিন্তা করতাম এবং ঘৃণা করতাম।

বকুর সঙ্গে দীর্ঘ দশ মাস পরে দেখা হলো। কিন্তু তাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। ফোনে সব সময় বলতো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। কথার ভেতরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা খুজে পেয়েছি বলে মনে হয় না। তার সঙ্গে দেখা করবো সেটাও অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। এটাই বুঝতে পারলাম না, আমাকে যদি সত্যি ভালোবাসে তাহলে তাকে সব কিছুতে কেন এতো অনুরোধ করা লাগবে।

তার জন্য আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। আমার বাবা–মা আমাকে খুব আদর করেন। তাছাড়া তাদের আমি একমাত্র মেয়ে। এই বলে যে আমার সব কিছুতেই হ্যা হবে সেটা তারা কোনোদিন মেনে নেবেন না। এবং সোজা বলে দিয়েছেন আমার পছন্দ হলে চলে যেতে পারি। তবে একটাই শর্ত, তাদের পরিচয় কখনো দিতে পারবো না। আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট, আমার বাবা আমাকে অনেক বড় প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন যে কখনো বকুর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। কেন যে বাবা মা এমন হন!

তবে সে যে, আমাকে একটু ফোন করবে তাও করে না। ছেলেদের মন যে জৈন্তাপুরের পাথর সেটা কখনো জানতাম না। ছেলেরা সব সময় মেয়েদের দোষ দিয়ে আসে, আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, প্রতিটা মুহূর্ত তাকে নিয়ে কল্পনা করি। যখন যা করি, সর্বক্ষণ মনে হয় তাকেও আমার সঙ্গে শেয়ার করি। আমার যা পছন্দ হয়, ইচ্ছা হয় তার জন্য নিয়ে যাই। তার কি আমার জন্য একটুও হৃদয়ে ব্যথা হয় না? ছেলেরা এতো পাষাণ হয় কিভাবে?

তার যা খাবার পছন্দ তা কখনো খেতে পারি না। এখন শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে আছি। আল্লাহ যদি সহায় হয় আর যদি আমার কপালে লিখে রাখে তাহলে হবে এবং সে যদি চেষ্টা করে। কারণ, আমি জানি ছেলেরা চেষ্টা না করলে কোনোদিন এসব বিয়ে হয় না।

আমার কথা হলো, বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে কখনো বিয়ে করবো না। সারাটা জীবন শুধু তার কথা ভেবে ভেবে যাবো। আমার বকুকে ইহকালে না পেলেও পরকালে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকবো। তারপরও আমার বকুকে চাই।

ভালোবাসা যে কি শুধু তারাই জানে যারা সত্যিকারভাবে ভালোবাসে। যারা উপরে এক অন্তরে গোলমাল তাদের ভালোবাসা আবার কি করে ভালোবাসা হয়! তাদের কাছে আমার শুধু এতোটুকু অনুরোধ কখনো মিথ্যা ভালোবাসায় জড়াবেন না। শুধু শুধু কষ্টই বাড়বে। কথায় আছে *স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিও না, দুঃখ পাবে।* ঠিক তাই যতোই স্মৃতিকে স্মরণ করছি ততোই হৃদয়টা ফেটে বোবা কান্না বের হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করছি স্মৃতিকে ভুলে যেতে। কিন্তু পারছি না। যতো ভুলে যেতে চাই ততো মনে পড়ে।

তবে জীবন থেকে কিছু জিনিস শিখেছি, কাউকে ভালোবাসতে নেই। ভালোবাসলে অধিক কাদতে হবে, ধ্বংস হতে হবে। আর কখনো অন্যের কাছে চাইতে নেই। চাইলে পাওয়া হয় না, বরং না চাইলে অধিক পাওয়া হয়। এবং সব কিছুতেই প্রাপ্তির প্রত্যাশা করতে নেই।

যেমন গীতায় একটা কথা আছে, *চিন্তা আর চিতা এই দুয়ের পার্থক্য হলো – চিতা জীবনহীনকে পোড়ায়। চিন্তা জীবন্তকে সারা জীবন জ্বালায়।*

*পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে*

## অরণ্যর মামণি

– অরণ্য, অনিন্দ্য ও টুকি–র বাবা

ভালোবাসা দিবসের এই শুভক্ষণে আমি একজনের কথা বলতে এসেছি। সেই একজন আমার হৃদয়ের গভীর তলদেশে সযত্নে লুকায়িত একটি মহা মূল্যবান রত্ন। সে আমার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। তাকে ছাড়া আমার জীবনের কথা ভাবতেই পারি না। সে আছে বলেই আমার অনেক স্বপ্ন আছে। জীবনের প্রতি হতাশ হতে পারি না তার কারণেই। তার সারাটা মন জুড়ে শুধু আমি, আমি আর আমি।

আমাকে সে ভালোবাসে এমনভাবে যেটা কাউকে বোঝাতে পারি না। ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ও শেষ বিন্দুতে সে উপনীত হয়ে আমাকে ভালোবাসে। তার মতো বৌ পাওয়া আমার চরম সৌভাগ্য। আজকের যুগে তার মতো সতী–সাধ্বী বৌ খুব কম হয়। আপনারা বলতে পারেন, এতো জোর দিয়ে কথাগুলো বলছি কি করে? আমি বলবো, বিশ্বাস ও আস্থা। আমরা দুজন দুজনাকে বিশ্বাস করি অন্ধভাবে। আমার দিয়ে কোনো ভুল হলেও হতে পারে। কিন্তু তার দিয়ে সেটা হবে না। তার মতো বৌ যার আছে তার অগাধ টাকা পয়সা না থাকলেও সে ব্যক্তির মতো ঐশ্বর্যশালী অন্য কেউ হবে না। বৌ যেহেতু আমার, তাই অনুভবটা আমিই করি। সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় আমার জান।

আমাদের দুজনার তিনটা স্বপ্ন ও রত্ন আছে। অরণ্য, অনিন্দ্য ও টুকি। অরণ্য আমাদের বড় ছেলে। সাংঘাতিক বুদ্ধিমান ও স্মার্ট ছেলে। কথা খুব বেশি বলে না। বয়স সাত বছর। দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করে। আমার চেয়ে তার মাকেই বেশি ভালোবাসে। এরপর অনিন্দ্য আধো আধো ভাষায় কথা বলে। নতুন হাটতে শিখেছে। ভারী দুষ্টু আর চঞ্চল। তাকে আমরা কৃকেটার বানাবো। জানি না ইচ্ছা পূরণ হবে কি না।

আমাদের শেষ রত্ন হলো টুকি। সে এখনো এই পৃথিবীর আলো বাতাস দেখেনি। তার মায়ের পেটেই একটু একটু করে বড় হচ্ছে। আমার ভীষণ মেয়ের শখ। আল্লাহ এই শখটা পূরণ করতে যাচ্ছে। আমি আমার মেয়েকে কিভাবে গড়ে তুলবো, কেমন সম্পর্ক হবে তার সঙ্গে, সে কি কি আবদার করবে, আরো অনেক কিছু আমি ভেবে রেখেছি। জানেন, তাকে একদিন স্বপ্নেও দেখেছি। তাদের এ তিনজনকে নিয়েই আমাদের স্বপ্ন ও আশা। দিন কাটছে এভাবেই।

যাহোক, ফিরে আসি বৌ–এর কথায়। আজ পর্যন্ত আমার বৌ আমাকে চিঠি লিখেছে ছয়শ চল্লিশটি। এই লেখা যদি ছাপা হয় তাহলে তখন এই সংখ্যা আরো বাড়বে। আমার বৌয়ের দেয়া প্রতিটা গিফট অত্যন্ত মমতা ও ভালোবাসা সহকারে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। একবার আমার আঙুল কেটে গেলে সে ব্যস্ত হয়ে হ্যান্ডিপ্লাস এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। সেটা এখনো রেখে দিয়েছি। আমার লেখা শেষ হয়ে এসেছে। সব স্বামী–স্ত্রীদের বলছি, প্রেমিক–প্রেমিকাদেরও আপনারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করুন। ভালোবাসুন অকৃত্রিম ভাবে। দেখবেন সুখী হবেন।

আরেকটা কথা, আমাদের যে তিনজন সন্তানের কথা বললাম তারা বাস্তবে কেউ নেই। আমরা কোনোদিনও বাবা–মা হতে পারবো না। বাস্তবে নেই, কিন্তু তারা আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। এই পৃথিবীর আরো অনেক যুগলই আছে যারা মা–বাবা হতে পারেনি। ওই সব ভেবেই সান্ত্বনা নিই।

*রাজশাহী থেকে*

# আংটি বদল

– সুভাষচন্দ্র সেন

১৯৮৮ সালের ঘটনা। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির শাটল ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম ওই ইউনিভার্সিটির বন্ধু ফজলে রাব্বীভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র।

ট্রেন যখন ষোলশহর দুই নাম্বার গেটে আসে তখন একটি ছাত্রী নেমে যায়। আমি যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছি সেই কম্পার্টমেন্টের একটা সিট থেকে সেখানে আরো তিনটা ছাত্রী বসা, আমি পাশে দাড়ানো। ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর একটি ছাত্রী আমাকে বলছে ইচ্ছা হলে বসতে পারেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে বসলাম।

সেদিন ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। যে ছাত্রীটি আমাকে বসতে বলেছে সে আমাকে বললো, আপনি কি এখানে পড়েন?

না।

তখন তারা তিনজনই হেসে বলে উঠলো, তাহলে ইউনিভার্সিটি কেন?

তখন এক ছাত্রী বললো, বুঝেছি, আজ ভালোবাসা দিবস তো, তাই তার প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে যাচ্ছেন।

বললাম, আপনার ধারণাটা ঠিক নয়।

তখন আমাকে যে ছাত্রীটি বসতে বলেছে সে বললো, এই, তোরা ফাজলামি করিস না ভদ্রলোকের সঙ্গে, কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও জানিস না?

ভদ্রলোক নয়, বলুন ভদ্রছেলে।
তখন ওই ছাত্রীটি একটু মৃদু হেসে বললো, আপনার নাম?
নাম বললাম এবং তার নামও জেনে নিলাম। তার নাম বনলতা। এবার আমি একটু হেসে বললাম, বাহ! বেশ সুন্দর নাম। নাটোর যেতে হবে না এখানেই পেয়ে গেলাম। তবে সব কিছু ঠিক থাকলেও আপনার চোখগুলো হরিণীর মতো।
বনলতা বললো, আপনি কি কাব্য চর্চা করেন নাকি, কবি নাকি?
আমার মধ্যে কি কবিত্ব খুজে পেলেন?
আরে না, ভাবে বোঝা যায়।
আপনি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী বুঝি?
তখন তার বান্ধবীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, এই বনলতা, উনি তোর জীবনানন্দ।
তখন বনলতা একটু লজ্জা পেল, বনলতা একটু হেসে বললো, আপনার মনোবিজ্ঞানেরই ছাত্র হওয়া উচিত ছিল। কারণ, আপনার ধারণাটাই ঠিক। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী।
এর মধ্যে ট্রেন এসে থেমে গেল। সবাই নামতে তাড়াহুড়া করছে। আমরা একটু পরে নামলাম।
বনলতা বললো, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমরা কি কিছু খেতে পারি?
বললাম, আপত্তি নেই।
একটা চটপটির গাড়ির সামনে গিয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে চারজনই চটপটি খেলাম। টাকা বনলতাই দিয়ে দিল। এর মধ্যে আমরা অনেকটা ফৃ হয়ে গেলাম। তার বান্ধবীদের মধ্যে একজন খুব দুষ্টু প্রকৃতির। সে বান্ধবীটি বললো, তোর জীবনানন্দ–র একটা স্মৃতি রেখে দে।
বনলতা কথা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, এসব কি বলছিস তুই?
বললাম, যেতে হবে বিদায় দিন।
বনলতা বললো, সত্যিই চলে যাবেন?
তো কি করবো?
একটু বসুন না!
আমরা একটা গাছ তলায় গিয়ে বসলাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হলো। বনলতাও এতো বেরসিক নয়। হঠাৎ বনলতা বলে উঠলো, আচ্ছা, আজকে তো ভালোবাসা দিবস। চলুন, আজকের দিনটাকে স্মরণ রাখার জন্য আমরা আংটি বদল করি। দেখুন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, কেউ কাউকে বিয়ে করতে হবে না।
ঠিক আছে। এই বলে আমার মুক্তার আংটিটি তাকে দিলাম।
সেও তার একটা রিং আমাকে পরিয়ে দিল।
তখন থেকে এখনো দুজনই বন্ধু হয়ে আছি।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## ফৃ সেক্স

– মাহমুদ আলম টিংকু

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ। ভর্তির জন্য বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছি দল বেধে। ঢাকা, খুলনা, সিলেট, চিটাগাং সব দেখা হচ্ছে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পালা এলো। মতিহারের সবুজ চত্বর দেখে এতো ভালো লাগলো, মন বসে গেল এখানে। গার্ডিয়ানদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ভর্তি হয়ে গেলাম প্রাণ রসায়নে। মন বললো, এখানেই লেগে থাক। এখানে তোর হবে।

নবাব আবদুল লতিফ হলে থাকতাম। সেই সময়ের সাপ্তাহিক *বিচিত্রা, যায়যায়দিন* পড়তাম। বিচিত্রায় *প্রবাস থেকে* নামে একটা পাতা ছিল। সেটা পড়ে পড়ে বিদেশে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল তখন থেকেই। তাছাড়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে কিছু বন্ধু তখনই স্কলারশিপ নিয়ে তখনকার সভিয়েট ইউনিয়নে পড়তে গিয়েছিল। তারা যখন ছুটিতে আসতো দেশে বা চিঠিপত্র মারফত বিদেশের রগরগে জীবনের একটা দিকের ছবি পাঠাতো তখন আমার ইচ্ছা প্রবলতর হতো।

আমার বন্ধু মিলন তাশখন্দে ছিল। মনোয়ার মস্কো-তে। এরা পরে রাশিয়ান মেয়েই বিয়ে করেছিল। মিলনের রুমমেট ছিল এক রাশিয়ান সুন্দরী। খুবই রূপবতী।

আমার সেই বয়সে বাংলাদেশের কোনো ছেলে তার রুমমেট একজন মেয়ে এমন চিন্তা অসম্ভব ছিল। মাথা খারাপ হওয়ার মতো খবর। বন্ধু লিখেছিল, সেই মেয়ে যখন-তখন রুমে পোশাক বদলায়, আরো কতো কিছু করে! আমার বন্ধুরা কি মজা করছে। আহা! আমি কেন বাংলাদেশে জন্মালাম? তখন কমরেড ফরহাদকে ধরেটরে রাশিয়া যাওয়া যায় কি না সেই চিন্তাও করেছিলাম।

বন্ধুরা ফৃ সেক্সের কথা বলতো। মনে মনে একটা ছবি একে ফেললাম *চাইলেই দেয়* জাতীয়। এর মধ্যে আরেক বন্ধু এলো আমেরিকা থেকে।

এক শুভ সকালে খোদ আমেরিকার সিল-ছাপ্পড় মারা আস্ত একটা পিনআপ ম্যাগাজিন আমার রুমে চলে এলো। সেটা আমি ভালো করে দেখার আগেই হলে হলে ঘুরলো। এবং বলতে বাধা নেই, মেয়েদের হল থেকে যখন ফিরে এলো তখন দেখি একদম মাঝখান থেকে দুইটা পাতা লাপাত্তা! সেই বিশেষ পেজের ফটোকপি মেয়েদের হলে মানে *তাপসী, রোকেয়া, মুন্নুজানে* চললো। তখনো *খালেদা জিয়া হল* হয়নি। সেই যুগে ভিসিআর বাণজ্যিক ভিত্তিতে পুরোদমে চলছে এবং ইউনিভার্সিটির লাগোয়া এলাকাতেই নিষিদ্ধ ছবিগুলোর রমরমা ব্যবসা। এসব দেখে পশ্চিমে ফৃ সেক্সের একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়ে গেল।

## WWW

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পাট চুকিয়ে বিদেশে আসার সুযোগ হলো। এবং তাও খোদ বিলেতে। তথাকথিত ফৃ সেক্সের পশ্চিমে মনে বড় আশা, পড়াশোনার পাশাপাশি যদি ভালোবাসাবাসি বা এতোদিনে যা শুনে এসেছি, ছবিতে, গল্পে, চলচ্চিত্রে তা যদি হয়ে যায় তাহলে সোনায় সোহাগা।

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় লন্ডন হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ডলিস হিল-এ মামার বাসায় এলাম। উদ্দেশ্য পড়াশোনা। মনে মনে আরো ছিল।

পরদিন সকালে ইউনিভার্সিটিতে যাবার উদ্যোগ। ঝকঝকে সুন্দর দিন। ঠাণ্ডা তো বটেই।

মামা বললেন, ছাতা নিয়ে যাও।

ছাতা আমার একদম অপছন্দ। মনের ভাব মনে রেখে মামাকে বললাম, ছাতা দিয়ে কি হবে মামা? আকাশ তো পরিষ্কার।

তখন মামা তার বিখ্যাত দার্শনিক উক্তিটি করলেন। বাবা, এই দেশে WWW, এই তিন W-কে বিশ্বাস করো না।

মানে বুঝলাম না মামা।

মানে সোজা, Work, Women, Weather এই তিন W-কে বিশ্বাস নেই।

প্রথম ও তৃতীয় W বিশ্বাস হলো। দ্বিতীয়টা নিয়ে সন্দেহ। কারণ মামা চিরকুমার। কথা না বাড়িয়ে ছাতার দিকে হাত বাড়ালাম। মনে বাজতে লাগলো www।

## দ্বিতীয় W সমাচার

ক্লাস শুরু হয়ে গেল ঝমঝমিয়ে। তার উপর কাজ করি সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। আহা মরি কিছু না। কোনো স্কলারশিপ নেই। নিজের টিউশন ফি নিজে যোগাড় করতে হবে। সপ্তাহের পাচ দিনে সুপারমার্কেটের কামলা হলাম। উইকএন্ডে ছুটির দুই দিনে Mori নামে এক জনমত জরিপে মার্কেট রিসার্চে ইন্টারভিউয়ের কাজ। জনমত জরিপের কাজ। সুতরাং রোদ–বৃষ্টি–ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ে বাসায় বাসায় ঘোরা। প্রশ্নপত্র হাতে। তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যে দাড়িয়ে ইন্টারভিউ নেয়া। এতোদিনে W - Work. একটা মর্ম হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে W - Weather–রও বুঝে নিলাম।

বাকি রইলো W - Women. এই আসল w–র প্রতি ঝোক অনেক বেশি। আর এখন যখন সেই ফৃ সেক্সের দেশে এসেই পড়েছি তখন কালক্ষেপণ কেন! হাতের কাছে, একেবারে নাকের ডগায় সব।

ক্লাসে টার্কির একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। চাল–চলন, কথা–বার্তায় ঝকঝকে। একেবারে খাপ খোলা তলোয়ার। সুন্দর ফিগার। প্রথমে ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেই। টার্কি মুসলিম দেশ। তাই তার ওপর ধর্মীয় একটা অধিকার তো ছিলই। দেখি ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে কি না।

নাম হচ্ছে চার্লা। একটু কনফিউজড ভাব মুখে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, ইউ মুসলিম?

উত্তর হ্যা। সে বললো, আমাদের মুসলিম নাম আছে। কিন্তু ব্যবহার করি না। তুমি চার্লা বলেই ডেকো।

নাম দিয়ে কি হবে? নাম সুন্দর। তাকে বললাম। সে খুশি হলো।

চার্লার কাছে ক্লাসে বসতে থাকলাম। এরই মধ্যে যা হবার হলো। একজন ভিলেইন এলো। তার মাথায় ছিল চুলের বাহার। কৃষ্ণাঙ্গ এই ছেলেটি ছিল মেধাবী। এখানে কালোদের চুলের নানান রকমের ফ্যাশন থাকে। এই ছেলের সুন্দর ঝকঝকে দাত। মুখে হাসি লেগেই আছে। চার্লা তার সঙ্গে ভিড়ে গেল। আর ভিড়ে যাওয়া মানেই যে কি তা ভেঙে বলার দরকার নেই। আমার মুসলিম উম্মাহর ফরমূলা মাঠে মারা গেল। চার্লা আর সেই কালোকে দেতো হাসি দিয়ে হাই–হ্যালো করে আমি বিরহী দিন কাটাতে লাগলাম।

হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই। কাক আর কবির দেশ থেকে এসেছি। ব্রাজিল সুন্দরী এমেলিয়ার দিকে নজর দিলাম। এর মন পাওয়ার জন্য স্পোর্টসশপ থেকে রোনালডোর জার্সি, টি–শার্ট কিনে গায়ে দেয়া শুরু করলাম। আমি আর্জেনটিনার সাপোর্টার ছিলাম। ম্যারাডোনা–র ঈশ্বরের হাত কোনো সাহায্য করেনি। এখন বাবা রোনালডো নন্দ কি জয়! রক্ষা করো বাবা। ইজ্জত তোমার হাতে। একটা গোল অন্তত দিতেই হবে। দেশে বন্ধুদের কাছে এ পর্যন্ত কোনো প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠাতে পারিনি। বাবা সাহায্য করো। তোমার নামে মিলাদ হয়ে যাবে।

সুন্দরীর ফাই–ফরমাশ খাটি। রসঘন সম্পর্ক হয়ে গেল। হাত ধরা, কাধ ধরা, জাপটে ধরা সবই চলে। কিন্তু আসল কাজ যে হয় না।

আমার বন্ধু মুন্সী আলী আকবর বলেছিল, প্রেমে বায়োলজি তো আছেই। ফিজিক্সও কাজে লাগানো যায়। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চেষ্টা শুরু করলাম।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে তার কাছেই বসেছি। আর কালক্ষেপণ নয়, আজ বলতেই হবে। ক্লাস ব্রেক–এ বললাম,তার হাত ধরে, আমি তোমাকে চাই।

সে আমাকে যা বললো তা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আমার গার্লফ্রেন্ড আছে।

আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করলাম না।

সে লেসবিয়ান। মনের দুঃখ মনে গোপন করে বললাম, অলরাইট। কিন্তু আমরাও বন্ধু হতে পারি।

নীল চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

### হালাল হারাম সমাচার

প্যারিস থেকে ইতিমধ্যে বন্ধু সুইটি ফোন করলো। সামারে চলে আয় এখানে। দুজন মজা করবো। ইওরোস্টারে মাত্র আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। প্যারিসে প্রচুর হালাল জিনিস পাওয়া যায়।

বিদেশে এসে অনেকেরই হালাল-হারাম বাতিক থাকে। আমার এসব সাধও এতোদিনে শিকেয় উঠেছে। বললাম, হালাল মেয়ে কিরে?

এখানে প্রচুর এলজেরিয়ান মুসলিম মেয়ে আছে। চলে আয়।

এতোদিনে আমার ফৃ সেক্সের আইডিয়াটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে। ফৃ সেক্স কি জেনেছি। যাকে যথা ইচ্ছা তথা, যে কোনো সময় চাওয়া এবং পাওয়াই ফৃ সেক্স নয়। পিনআপ ম্যাগাজিন বা নিষিদ্ধ ছবি পশ্চিমের একটা অপচিত্র মাত্র, ভুল ধারণা। এগুলো লোকমুখে ঘোরে, রঙ মেখে আরো রগরগে হয়।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ভালোবাসার সম্পর্ক হলে শরীর এসে যাবে। এ সম্পর্কে দুপক্ষেরই সম্মতি চাই। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ চমৎকার। এদের রাখঢাক নেই। বাস-ট্রেন, পথ-পার্কে দেখা যাবে এদের আনন্দঘন চুমুর দৃশ্য। এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক ফতোয়া নেই।

এ দেশে এসে তাই নতুন কিছু শব্দের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। যেমন সিঙ্গল পেরেন্ট, বায়োলজিকাল ফাদার, স্পার্ম ডোনার, স্পার্ম রিসিভার, স্পার্ম ব্যাংক, গে কাপল (Gay Couple), ফস্টার। এগুলোর ফৃ সেক্সের অনুজাত। টাকা খরচ করে যেমন টানবাজারে যাওয়া যেতো অথবা এখন ঢাকার বিভিন্ন গেস্ট হাউসে যাওয়া যায় তেমনি পশ্চিমেও এ রকম ব্যবস্থা আছে। তবে এসব ফৃ সেক্স নয়। পেইড (Paid) সেক্স - টাকা দিয়ে কেনা সেক্স। পশ্চিম ফৃ সেক্সের দেশ নয়, পশ্চিম হচ্ছে ফৃ সোসাইটির দেশ। যেখানে আছে ওয়েলফেয়ার ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পরিচালিত মানব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। হায়ার এডুকেশন বা উচ্চতর শিক্ষা এবং এডভান্সড সায়েন্স বা অগ্রসর বিজ্ঞান। পশ্চিমে আছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পশ্চিমের এ ভালো দিকগুলো আমাদের জানা দরকার। জীবন এখানে প্রবহমান।

### এবং ইয়া হু উ

অবশেষে ফৃ সেক্সের আশায় ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে গিয়ে বৌ নিয়ে এসেছি। বৌ, বাচ্চাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি কাজকেও। ওয়েদারকেও ভালোবাসার চেষ্টা করছি। বলে রাখা ভালো, বৌ এনেছি মতিহারের সবুজ চত্বর থেকেই। www-তে থিতু হওয়ার চেষ্টা করছি। বৌয়ের ভালোবাসায় অভ্যস্ত হচ্ছি। তাই আর আহা, উহু নয়। আমরা যে যেখানে আছি, সবাই যেন ভালোবাসায় থাকি। ইয়া হু উ।

*বেথনাল গ্রীন, লন্ডন থেকে*
mahmur7@yahoo.co.uk

## প্রথম, শেষ এবং একমাত্র

– প্রত্যাশার আব্বু,

কেমন আছো? কতোদিন তোমাকে দেখিনি আর কতোদিন তোমার সঙ্গে কথা হয়নি। কিন্তু প্রতিটি রাতে তুমি আসো আমার স্বপ্নের মাঝে একান্ত আমার হয়ে। একটা সময় ছিল যখন আমি বুঝতাম, আমি যতোটা না আমাকে বুঝি তারচেয়ে অনেক বেশি তুমি আমাকে বোঝো। আমি কখনো ভাবিনি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে। কিন্তু তুমি সেটাই করেছো।

তোমার কি কখনো আমাকে মনে পড়ে না? আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তুমি আমার প্রথম, শেষ এবং একমাত্র ভালোবাসা। সারা জীবনে হয়তো এই ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন হবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

একদিন সব কিছু নিচে চাপা পড়বে। তবুও কোনো পরিবর্তন হবে না। বহুদিন বহু কাগজে, বহু কলমে তোমাকে লিখেছি। লিখছি বা লিখবো। কিন্তু লেখাগুলো পৌছানোর কোনো পথই খোলা রাখোনি। নিজের ভালোবাসা নিজের কাছেই রাখি। তাই ভালোবাসা দিবসটিতে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই আমার শেষ লেখা যায়যায়দিনের মাধ্যমে।

আমার ভালোবাসা নিয়ে আরেকটা লেখা লিখেছিলাম মনে আছে তোমার। তখন কতো সুন্দর ছিল আমাদের সম্পর্ক, অথচ আজ কতো দূরে আমরা! কিন্তু কেন আমার সঙ্গে এ রকম করলে? হয়তো ভালোবাসার মতো কিছু ছিল না, ভালোলাগার মতো কিছু ছিল না...। জানি না আমাকে ছেড়ে তুমি কতোটুকু ভালো আছো? এখন তো আর তোমার কোনো পিছু টান নেই। কারো ফোন ধরার জন্য সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে হয় না। রাত জেগে মশার কামড় খেয়ে উত্তর লিখতে হয় না। কষ্ট করে ডায়ালগ জোগাড় করতে হয় না। আগের জীবনের চেয়ে এই জীবনটা অনেক সুখের তাই না? আমি দোয়া করি এই সুখ যেন তোমাকে ছেড়ে না যায়।

প্রত্যাশার আব্বু,

তোমার হৃদয়ে আমার জন্য যখন ছিটেফোটা ছিল না তখন কেন আমাকে নিয়ে খেললে? আমি তো তোমাকে কখনো জোর করিনি বা বাধ্য করিনি। তাহলে আমার অপরাধটা কি? তোমাকে পাগলের মতো, অন্ধের মতো ভালোবেসেছিলাম, এটা? তুমি হয়তো জানো না, এক সঙ্গে অনেক জনকে নিয়ে খেলতে হলে ভালো এবং পাকা খেলোয়াড় হতে হয়। তুমি আমাকে বলতে পারতে। আমি তোমাকে হেলপ করতাম। যে দিনগুলোতে আমাদের সম্পর্ক ছিল তার প্রতিটি দিন আমি তোমাকে ভালো রাখতে, খুব বেশি ভালোবাসতে চেষ্টা করেছি। এমন কোনোদিন নেই তোমাকে পাচ সাতবার ফোন করিনি। যেদিন কথা হয়নি সেদিন সারা দিন–রাত অস্থিরভাবে কেটেছে। ঠিক মতো খেতে পারিনি, ঘুমাতে পারিনি, চোখ দিয়ে পানি পড়েছে। শুধু বার বার বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়েছি। সেসব তুমি কোনোদিন বোঝোনি বা বোঝার চেষ্টা করোনি। কারণ, এগুলোর চেয়ে তুমি বন্ধু–বান্ধবী, ফেন্সি এগুলোকে বেশি মূল্যায়ন করতে। আমি ছিলাম ফোর সাবজেক্টের মতো একটা বিষয়। না থাকলে অসুবিধা নেই, তাই না?

সবই বুঝতাম, তারপরও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মতো ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আমাকে দেয়নি। কেউ কখনো বোঝাতে পারিনি তুমি খারাপ ছেলে। কিন্তু তুমিই সেটা বুঝিয়ে দিলে আর এমনভাবে বোঝালে যে, আমার সব স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা কাচের গ্লাসের মতো ভেঙে গেল। সেই ভাঙা কাচগুলো যখন অনেক দূরে ফেলে দিলাম ঠিক তার অনেক দিন পর তুমি এলে ভাঙা কাচগুলো জোড়া দিতে। তুমিই বলো, এটা কি সম্ভব?

প্রত্যাশার আব্বু,

তোমার কি কখনো আমাদের সেই সব রাতের কথা মনে পড়ে না? সারা রাত ফোনে গল্প করতাম, টিভি দেখতাম। তখন কি আমার কোনো আবেগ এতোটুকু আচ্ছন্ন করিনি? তোমাকে কি দিইনি? নিবিড় ভালোবাসার আড়ালে তোমাকে ঘিরে রেখেছিলাম, বলো রাখিনি? এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করতে করতে অনেক দিন পার করে দিলাম। তুমি তোমার দেয়া একটা কথাও রাখোনি। অনেক অভিযোগ থাকলেও সত্যি কথাটা হলো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাই বলে পারবো না তোমার জীবনে ফিরে যেতে। ভালোবাসা বলতে তুমি কি বুঝতে আমি জানি না। হয়তো কিছু মন ভরানো ডায়ালগ অথবা কিছু মিথ্যা স্বপ্ন। কিন্তু আমার কাছে ভালোবাসার অর্থ ছিল, যাকে ভালোবাসি তাকে ভালো রাখা আর আমি সব সময় তা–ই চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, সেই ভালো রাখার সুযোগটা তুমি কেড়ে নিলে। শুধু একটা কথা, আমার নামে আজেবাজে কথা বলো না।

আসলে ভালোবাসা যার যার মনের ব্যাপার, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি বলে তুমি আমাকে ভালোবাসবে তার তো কোনো ধরা–বাধা নিয়ম নেই। তুমি তো অন্য কাউকে ভালোবাসতেই পারো। অন্য কাউকে নিয়ে সংসার পাতার ইচ্ছা তোমার হতেই পারে। শুধু শুধু আমার সঙ্গে এই লুকোচুরি খেলা না খেললেই পারতে। তুমি তোমার যে চাদবৌকে হারিয়েছো তাকে আর খোজার চেষ্টা করো না। তাকে কোনোদিনই তুমি পাবে না। বর্তমানে যে মানুষটি তোমার সঙ্গে কথা বলে তার সঙ্গে সব কষ্ট শেয়ার করো। এবং এই কামনায় করি যেখানেই থাকো, যেভাবেই থাকো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর থেকো, নিজের প্রতি যত্ন নিও – অবহেলা করো না। মা–বাবা, ফ্যামিলির প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো পালন করো। কখনো তাদের কষ্ট দিও না। সব ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে জীবন শুরু করো।

সব সময় একটা কথা মনে রেখো, আল্লাহ যা করে মঙ্গলের জন্য করে। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, এই ভেবে আর কোনো পাপ করো না। দেখলেই তো সব পাপের ফল পেতেই হয়। সামান্যতম যদি ভালোবাসা থাকে আমার জন্য তবে এ কথাগুলো রেখো তাহলেই আমি সুখী। মনে রেখো, কেবল একজন ছিল যে ভালোবাসতো শুধু তোমাকে।

তোমার **চাদবৌ**, *যশোর থেকে*

# আহম্মক

– মাইনু

রাত পৌনে একটা। প্রায় চল্লিশ মিনিট হবে বাসরঘরে একা একা বসে আছি। কোনো সাড়া নেই, কারো আসার নামও নেই।

বিয়েতে আমার বিন্দুমাত্র মত ছিল না। কারণ, কাউকে যে ভালাবাসতাম তাও না। কেউ যে ছ্যাকা দিয়েছে তাও না। আসলে পুরুষ জাতটার প্রতি একটা ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। আশপাশের বান্ধবীদের কষ্ট দেখে, পত্রপত্রিকায় নারী নির্যাতনের খবর পড়ে পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে যেতো। কি দুঃসাহস তাদের। যখন দেখতাম পত্রিকায় যৌতুক লোভী স্বামীর নির্যাতনের কাণ্ডকারখানা তখন সত্যি বলতে কি স্বামীদের উপর না বৌদের ওপরই আমার রাগ হতো। কি বোকা বৌ–রে বাবা! তোরা কি প্রতিবাদ করতে পারিস না? তোদের হাতে কি বল নেই?

তাই যদি না থাকে তবে কেন পড়ে থাকিস দানবটার সংসারে। লাথি মেরে চলে আয়। দেশে আইন আছে, আদালত আছে। তাছাড়া মেয়েদের প্রতি অনেক সংস্থাই অনেক কনসিডার করে থাকে, কেস চালাতে সাহায্য করে থাকে। তোদের জায়গায় আমি থাকলে... থাক আর বললাম না।

তারপর বান্ধবীদের যখন দেখি দিনের পর দিন পাগলের মতো ভালোবাসে এবং শেষমেষ ফল শূন্য পায়, চোখের জলে কেদে বুক ভাসায় তখন সত্যিই আফসোস লাগে ওদের জন্য। কেন যে তোরা ভালোবাসতে গেলি ! কি বা এমন ক্ষতি হয় ভালো না বাসলে?

মাদার টেরেসা–র কথাই ধর। তিনি কি ভালোবাসেননি? অবশ্যই বেসেছেন। কিন্তু তোদের মতো আহাম্মকি নয় সে ভালোবাসা। উত্তরে তারা বলতো, এমন দুই একজন ব্যতিক্রম।

ডিসিশন নিলাম, আমিও দুই একটা ছ্যাকা দেবো। কিন্তু ফলাফল ভাবতে গিয়ে দেখলাম, ওই সব অমানুষদের সঙ্গে আমার আর পার্থক্য থাকে না।

চূড়ান্ত ডিসিশন নিলাম, জ্বালাবো শুধু একজনকে। ছাই করে দেবো, ফালাফালা করে দেবো তার জীবন। যতো সুখ–আশা, আকাঙ্ক্ষা আছে সব ভেঙে দেবো। সেই প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে রাত দুটা বেজে গেল। কারো আসার কোনো নামগন্ধ নেই। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। খুব ঘুম পাচ্ছিল।

শুতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ হই চই–এর শব্দে দরজা খুলে গেল। আগের মতো ঘোমটা মুড়ি দিয়ে কাপড়ের পুটলির মতো সটান হয়ে বসে থাকতে হলো। বিশাল ঘোমটার জন্য দেখতেও পাচ্ছিলাম না কিছু। আবার ওড়নার ফাক দিয়ে দেখতে গেলে উলটা তারাই না আমার ড্যাব ড্যাব করা চোখ দেখে ফেলে। কি মহা মুশকিল!

কে একজন বললো, ভাবী, তোমার ওই লম্বা ঘোমটাটা তোমার চেয়ে তোমার গুণধর স্বামীকেই মানাবে বেশি। এক ঘণ্টা আগে দরজার সামনে দিয়ে গেছি, এসে দেখি এখনো সেই একই জায়গায়। কতো জোর জবরদস্তি করে ভেতরে আনলাম। এখন তুমি বুঝে নাও আমরা গেলাম।

হই চই থেমে গেল অনেকক্ষণ। কিন্তু কোনো সাড়া–শব্দ নেই কেন? ঘোমটাটা একটু ফাক করতেই চোখ গেল মেঝেতে। দেখলাম শাদা পাজামা পরা একজোড়া পা ঠক ঠক করে কাপছে। বুঝতে পারলাম বসে থাকলে এভাবেই সারা রাত কেটে যাবে। তাই ঘোমটা তুলে দজ্জাল বৌয়ের মতো ইডিয়টটার চার পাশ ঘুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম?

জবাব পেলাম পাক্কা দেড় মিনিট পর কাপাকাপা গলায়, আহাদ আহমদ।

ঘটনা আর বেশি দূর এগোলা না। ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে ঘুম থেকে জেগে দেখি খাটের এক পাশে কাচুমাচু হয়ে বেচারা ঘুমিয়ে আছে। দেখে মায়াই লাগলো। না, মায়া লাগলে কিছুতেই চলবে না। এটাই হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য, সাধনার ধন। এটাকেই পুড়িয়ে অঙ্গার করতে হবে। জোরে গলা ঝাড়ি দিলাম। ধড়মড়িয়ে উঠলো বিছানা থেকে। ডাক পড়লো। কিন্তু কার ডাক বুঝতে পারলাম না।

কতোক্ষণ পর ঘরে ঢুকলেন মধ্য বয়স্কা একজন ভাবী। ঢুকেই চিৎকার চেচামেচি, বলি, সংসারটা কার, আমরা অতিথিরাই সব করবো? আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন রান্না ঘরে। কেটলিতে পানি ফুটছে। বললেন চা বানাতে।

জীবনে চা বানাইনি বললে মিথ্যা হবে। তবে এর স্বাদ কখনোই গরম পানির চেয়ে উত্তম হয়নি।

চুপচাপ দাড়িয়ে রইলাম। কতোক্ষণ পর তিনি এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বললেন, এভাবে পটের বিবির মতো দাড়িয়ে থাকলে চলবে? দুজনের সংসার, বলা–কওয়ার লোকও পাবে না।

দুজনের সংসার শুনে মনে মনে বেশ খুশিই হলাম। ব্যাটাকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে। আস্তে আস্তে সব মেহমানই চলে গেল। ঘরে শুধু ওই আহম্মকটা আর আমি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো, খাওয়া–দাওয়ার কোনো নামগন্ধও নেই। এদিকে ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে। আহাম্মকটাকে গিয়ে কড়া গলায় বললাম, দশ মিনিটের মধ্যে আমার খাবার চাই। বলে ঘরে চলে এলাম। ভাবলাম বাবা মায়ের কথা। যদি জানতে পারেন আমি না খেয়ে আছি তাহলে কি করবেন তারা। এ জন্য অবশ্য আমিই দায়ী। বিয়ের আগে সাফ সাফ বলেছিলাম, আমি কারো ঘরের বৌ হবো না, স্ত্রী হবো।

হঠাৎ দেখি বিরিয়ানির প্যাকেট হাতে ঢুকলো গবেটটা। প্যাকেট নিয়ে কড়া গলায় বললাম, ক্ষিধে আমি একদম সইতে পারি না। টাইম টু টাইম আমার খাবার রেডি চাই। এবং হোটেলের খাওয়া খুব একটা পছন্দ নয় আমার।

এরপর আলু ভর্তা ভাতে বেশ কয়দিন কাটলো। বাবা মা ফোন করলে মুরগি আর গরু ছাড়া কথাই হতো না। অনেক কষ্টে বিয়ের নয় দিনের মাথায় একটা কাজের ছেলে পাওয়া গেল। দুদিন ভালোই চলছিল। তিন দিনের মাথায় ছেলে গায়েব। পুনরায় খাদ্য সংকট। এরই মধ্যে করে বসলাম অন্যায় আবদার, অবশ্যই আমার হিসেবে ন্যায়।

আগামীকাল সকালে পরোটা ভাজি খাবো।

পোড়া গন্ধে ঘুমের একটু ব্যাঘাত ঘটছিল। কিন্তু বিকট শব্দে ঘুমটা পুরোটাই ভেঙে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি পরোটার সাইজ একটা বাংলাদেশ, একটা ইনডিয়া, কোনোটা আবার এশিয়া মহাদেশ। এক সাইড কালো কুচকুচে, আরেক সাইড একেবারে শাদা। তাপাটা উল্টে পড়ে আছে নিচে। আহাম্মকটা হাতে পানি দিচ্ছে অনবরত।

সম্ভবত গরম তেল পড়েছে। আমাকে দেখে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলো।

ভবিষ্যতে যেন আর এমন না  হয় বলে চলে এলাম।

কথাটা নিজের কানেই কেমন বেখাপ্পা শোনালো। কি করছি আমি এসব! ছোট ভাইয়া যদি শোনে তাহলে নির্ঘাত ইডিয়টটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দেবে। তারপর বলবে, ব্যাটা বৌই যদি কন্ট্রোল করতে না পারিস তবে বিয়ে করলি কেন?

দুপুরবেলা আলু কাটতে গিয়ে হাতই কেটে ফেললো। যেই আমি সামনে গেলাম অমনি হাতটা পেছনে নিয়ে গেল আর তার দুই চোখের পানি টলমল করতে লাগলো। মনে হয় যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছে।

নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এবং নিজের অজান্তেই কাদতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম এ কোন আমি? কেন এতো রূঢ় আচরণ করছি? এবং করছিই যদি  তাহলে কাদছি কেন? শেষ পর্যন্ত আমার কপালে এমন এক আহাম্মক জুটলো! একে জ্বালাবো কি? নিজেই তো জ্বলে মরছি। একে ফালাফালা করা মানে নিজেকেই ফালাফালা করা।

মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করলাম আহাম্মকটার কাছে।

হেরে গেলাম আমি।

আসলে এমন আহাম্মকের সঙ্গে কোনোদিন জেতা যায় না। জিততে গেলে কষ্ট ছাড়া কিছুই পাওয়ার থাকে  না। সব ছেড়েছুড়ে সংসারের হাল ধরলাম। ফলাফলে বিয়ের একচল্লিশ দিনের মাথায় এক প্রেমপত্র পেলাম। এও ছিল কপালে! যাও বা পেলাম অসংখ্য কাটাকাটিতে ভরা শুধু একটি লাইন ছাড়া।

*আপনি কি আমাকে অপছন্দ করেন?*

এটা যে বাংলায় লেখা সেটা বুঝতেও অনেক সময় লেগেছিল। মানুষের বাংলা ভাষা নিজের মাতৃভাষায় লেখা যে এতো জঘন্য হয় তা আগে জানা ছিল না। যদিও জন্মস্থান সূত্রে সে বাঙালি না। আপনারাই বলুন, পাঠক পাঠিকারা, জীবনে শুনেছেন নিজের ঘরের বৌকে কেউ প্রেমপত্র দেয়? রাগে–দুঃখে, অপমানে অভিমানী আমি প্রতীক্ষায় রইলাম, কবে আমার মান ভাঙাবে সে।

আজ প্রায় তিন মাস হতে চললো তার ও আমার মধ্যে কোনো রকম রিলেশন হয়নি। এমনকি আজ পর্যন্ত আমার হাতটা পর্যন্ত ধরলো না। আসছে ভালোবাসা দিবস। জানি না কেমন কাটবে আমার সেই দিবস। আহাম্মক স্বামী অথবা প্রেমিক কি আর কেউ আছে?

*আজিমপুর, ঢাকা থেকে*